৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

লেকচার: ১২

টপিক:

- ✓ **অর্থনৈতিক অঞ্চল:** EPZ, EEZ, BIDA, BEPZA, BEZA, শিল্পায়নের প্রতিবন্ধকতা।
- ✓ **সমসাময়িক যোগাযোগ:** আইসিটি, মিডিয়ার ভূমিকা, তথ্য অধিকার এবং ই-গভর্ন্যান্স।
- ✓ **অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান:** সুশীল সমাজ, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ও বাংলাদেশের এনজিও।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

09666775566
www.uttoron.academy

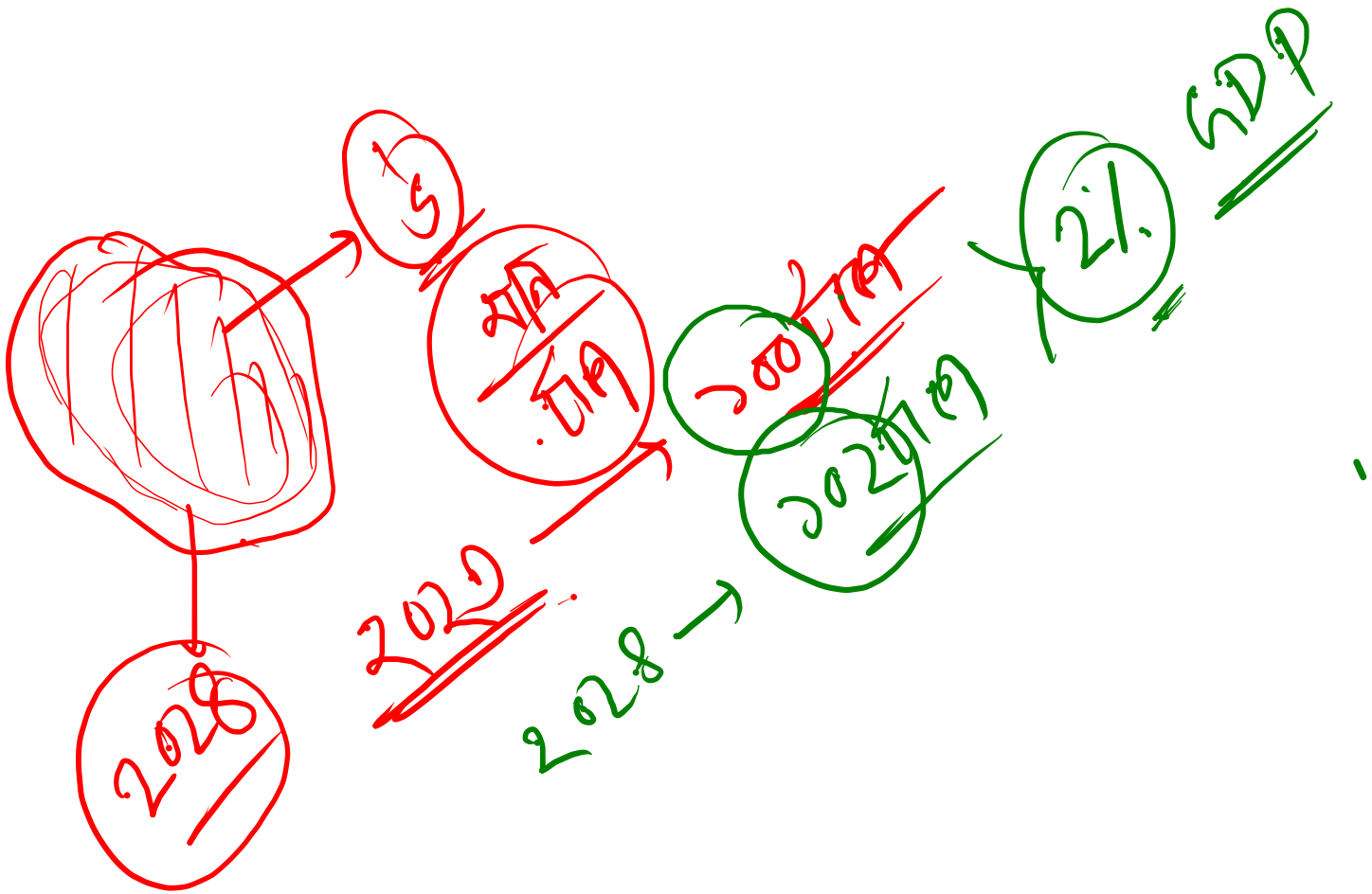

GDP

অর্থনৈতিক অঞ্চল - EPZ

➲ ইপিজেড (EPZ) :

EPZ এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Export Processing Zone. রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানাদি স্থাপনের জন্য নির্ধারিত বিশেষ এলাকাকে EPZ বলা হয়। ১৯৮০ সালে দেশে সর্বপ্রথম EPZ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইন প্রণীত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় প্রথম EPZ প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ১০টি EPZ রয়েছে। যার মধ্যে ৮টি সরকারি ও ২টি বেসরকারি।

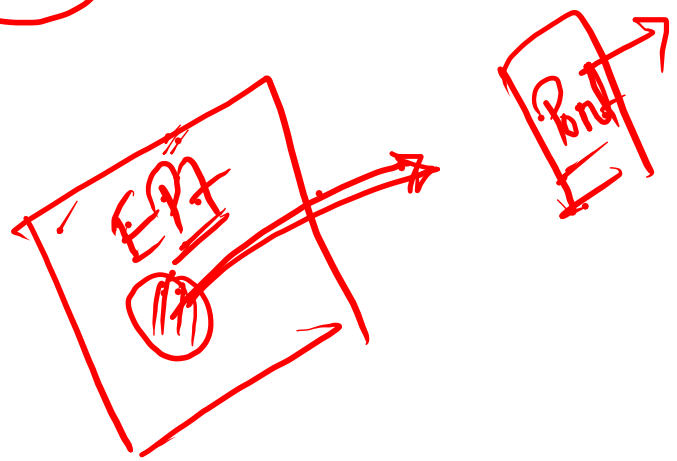

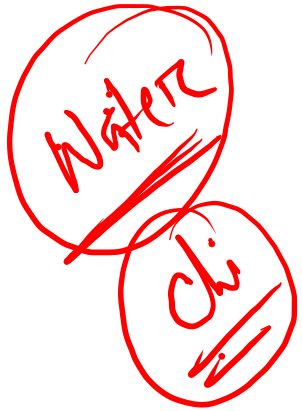

অর্থনৈতিক অঞ্চল - EPZ

বাংলাদেশের সরকারি EPZ সমূহ

ক্রমিক নং	নাম	অবস্থান	যাত্রা শুরু	আয়তন
১	চট্টগ্রাম	হালিশহর, চট্টগ্রাম	১৯৮৩ সালে	৪৫৩ একর
২	ঢাকা	সাভার, ঢাকা	১৯৯৩ সালে	৩৬৫.২২ একর
৩	মোংলা	মোংলা, বাগেরহাট	১৯৯৯ সালে	২৫৫.৪১ একর
৪	কুমিল্লা	বিমান বন্দর, কুমিল্লা	২০০০ সালে	২৬৭.৪৬ একর
৫	ঈশ্বরদী	পাকশি, পাবনা	২০০১ সালে	৩০৯ একর
৬	উত্তরা	সঙ্গলশী, সদর, নীলফামারী	২০০১ সালে	২১৩.৬৬ একর
৭	আদমজী	নারায়ণগঞ্জ	২০০৬ সালে	২৪৫.১২ একর
৮	কর্ণফুলী	পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম	২০০৬ সালে	২০৯.০৬ একর

অর্থনৈতিক অঞ্চল - EPZ

বাংলাদেশের বেসরকারি EPZ সমূহ

ক্রমিক নং	নাম	প্রতিষ্ঠা	অবস্থান	আয়তন
১	রাঙ্গুনিয়া ইপিজেড	১৯৯৯ সালে	চট্টগ্রাম	-
২.	কোরিয়ান ইপিজেড	১৯৯৯ সালে	চট্টগ্রাম	২৪৯২ একর

বাংলাদেশের EPZ সমূহের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে রয়েছে বাংলাদেশ ইপিজেড কর্তৃপক্ষ (BEPZA)। BEPZA এর তথ্যানুসারে ইপিজেড থেকে মোট রপ্তানির সিংহভাগই হয়ে থাকে ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেড থেকে।

ইপিজেডসমূহের সাফল্যের চিত্র

এ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহে জাপান, কোরিয়া, চীন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, সুইডেন, নেদারল্যান্ডস, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভারত, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, তুরস্ক, ইউক্রেন, কুয়েত, রুমানিয়া, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, শ্রীলংকা, বেলজিয়াম, ব্রিটিশ ভার্জিন, ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ ও বাংলাদেশসহ প্রায় ৩৮টি দেশ বিনিয়োগ করেছে। দেশের ইপিজেডসমূহ রপ্তানি বহুমুখীকরণে ও বৈচিত্রায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে দেশের ইপিজেডসমূহে ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য, গাড়ির যন্ত্রাংশ, মোবাইল ফোনের যন্ত্রাংশ, ক্যামেরা লেন্স ও পার্টস, বিদ্যুৎ, বাই-সাইকেল, ব্যাটারি, গলফ শ্যাফট, জুতা ও জুতার এক্সেসরিজ, টেক্সটাইল, এনার্জি সেভিং বাল্ব, আসবাবপত্র, তাঁবু, বুলেট প্রুফ জ্যাকেট, কসমেটিকস ও হলিউড মাস্ক, চশমা, খেলনা, পোশাক ইত্যাদি পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে।

পরিবেশ উন্নয়নে বেপজা কর্তৃক ইপিজেডসমূহে ২২৯ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার প্যানেল এবং ইপিজেডের অভ্যন্তরের রাস্তায় ৮০০টি সোলার লাইট স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেডে এনভায়রনমেন্ট ল্যাব, বেসরকারি উদ্যোগে আদমজী, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা ইপিজেডে পানি পরিশোধনাগার (WTP) চালু করা হয়েছে। এছাড়া, বেসরকারি উদ্যোগে চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং কুমিল্লা ইপিজেডে কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (CETP) চালু করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক অঞ্চল - EPZ

মানব উন্নয়নে ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২০১৮ সালে বৃদ্ধি করা হয়েছে। শ্রম পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬০ জন সোস্যাল কাউন্সিলর নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। মালিক-শ্রমিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে ৮টি ইপিজেডের জন্য ৩ জন কন্সিলিয়েটর (মীমাংসাকারী) এবং ৩ জন আরবিট্রেটর (সালিশকারী) নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া ইপিজেডস্থ শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা এবং কল্যাণের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ এবং স্বতন্ত্র নতুন শ্রম আইন 'বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯' প্রণয়ন করা হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সকল ইপিজেডে প্রসেস অটোমেশন সিস্টেম (Online Export & Import Permit, Bill Collection, Work Permit, Pay Roll Management etc.) চালু করা হয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম, ইনটার-এক্টিভ (Interactive) ওয়েবসাইট, ইপিজেডসমূহে Wi-Fi স্থাপন এবং Remote Communication Electrical Meeting System স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া ইপিজেড এবং ইপিজেডে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে ইপিজেডসমূহে CCTV Surveillance System প্রবর্তন এবং Metal Archway, Automated Access Control Gate ইত্যাদি স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

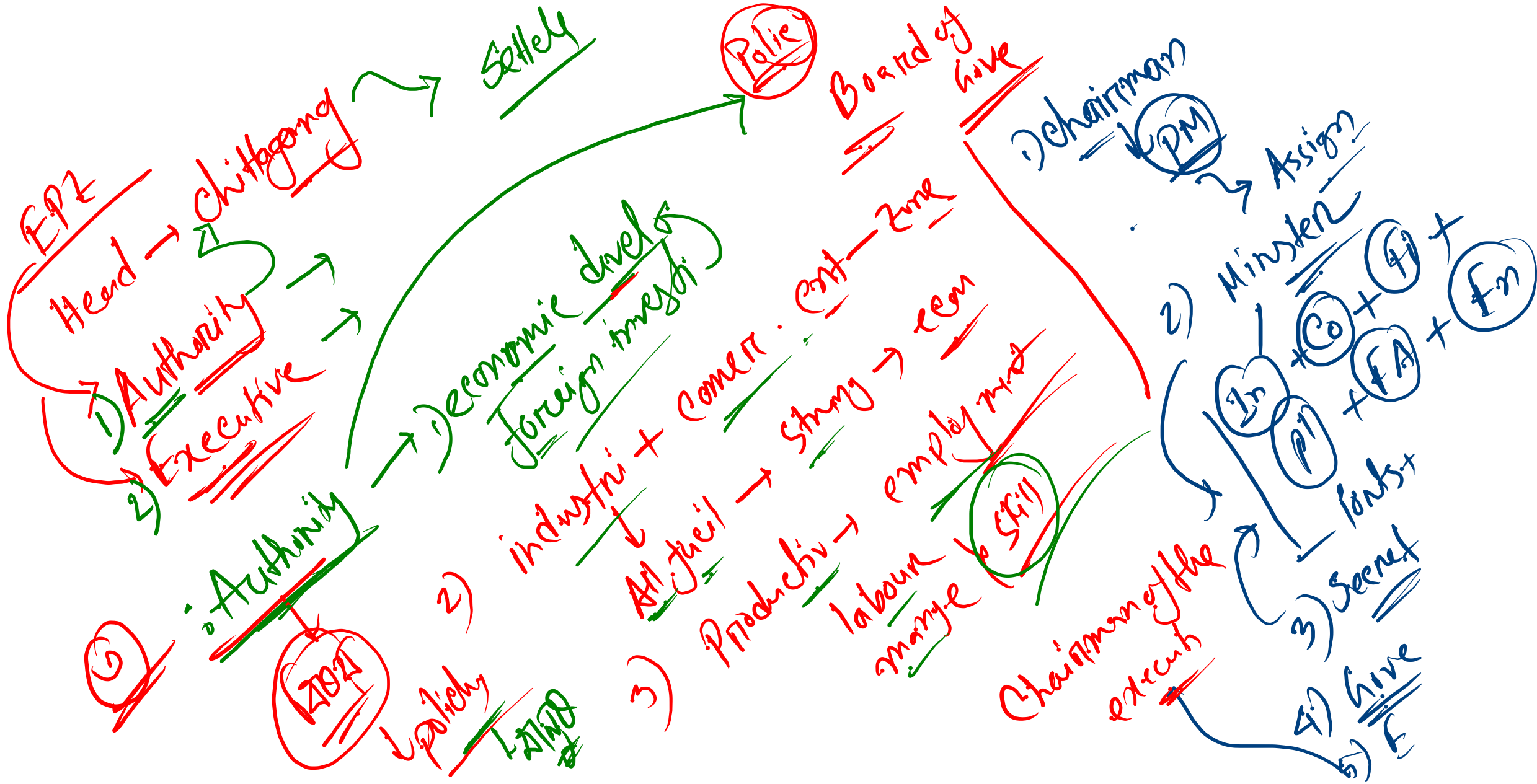

EPZ

Head → Chittagong → Settly

1) Authority

2) Executive

① Authority → 2021 policy LAWD

1) economic devel
Foreign investi

2) industri + comerc. cont — Zone
All facil → Strong → econ
Productiv → employment
labour manage Skill

3)

Polic

Board of Gove

1) chairman PM → Assign

2) Minister
Im + Co + Fi + FA + Fm + Pl
Ports+

3) Secret

4) Gove

5) F

Chairman of the executi

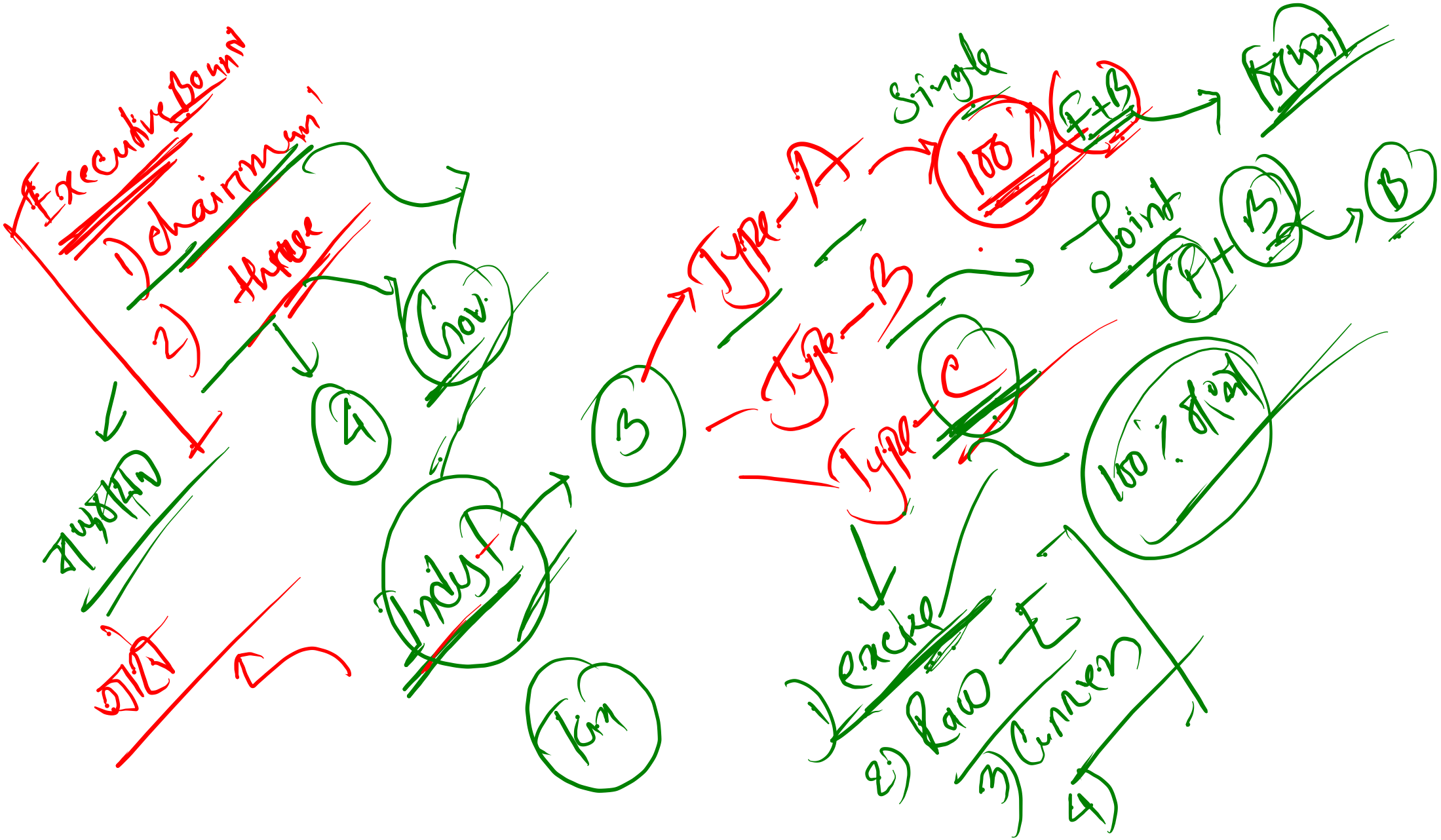

Executive Board
1) chairman
2)
4
Gov.
Indust
B
Type-A
Type-B
Type-C
Single
100%
F+B
Joint
F+B
B
2) Raw
3)
4)

অর্থনৈতিক অঞ্চল - EPZ

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা। বাংলাদেশ সরকার দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) আইন ১৯৮০ (আইন নং-৩৬) এর মাধ্যমে "বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ" (বেপজা) গঠন করে। বেপজা বিগত প্রায় ৪০ বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইপিজেড স্থাপনপূর্বক দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আনয়ন, বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং প্রযুক্তি আহরণের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা সরকারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যপূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বেপজা'র চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

বেপজা'র রূপকল্প (Vision): বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা।

অর্থনৈতিক অঞ্চল - EPZ

বেপজা'র অভিলক্ষ্য (Mission): বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে ইপিজেডসমূহে-

• শিল্পায়ন	• বিনিয়োগ উন্নয়ন	• কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং	• রপ্তানি বৃদ্ধি

বেপজা'র প্রধান কার্যাবলি

- শিল্প মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক, নিরাপদ ও শ্রম অধিকার সমুন্নত রেখে নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদনমুখী কর্মপরিবেশ সৃষ্টি।
- শিল্পায়নের উদ্দেশ্যে ইপিজেডসমূহে নতুন প্রযুক্তি আনয়নে বিনিয়োগকারীগণকে উৎসাহিত করা।
- শিল্প বিনিয়োগের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি।
- নতুন শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
- দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের লক্ষ্যে নতুন ইপিজেড তৈরি।
- ইপিজেডস্থ শিল্প কারখানাসমূহের বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখা।

অর্থনৈতিক অঞ্চল - EPZ

বেপজা'র উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ

- বেপজার অধীনস্থ ইপিজেডসমূহে উৎপাদনে আসা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪৭০ হতে ৪৮০ এ উন্নতিকরণ।
- প্রকৃত বিনিয়োগের পরিমাণ ৪.৮৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে ৫.০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নতিকরণ।
- বার্ষিক রপ্তানির পরিমাণ ৭.২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে ৭.৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নতিকরণ।
- ইপিজেডসমূহের শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের পরিমাণ ৫,১৪,০০০ জন হতে ৫,২০,০০০ জনে উন্নীতকরণ।

বেপজা'র সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

- **সমস্যা:** বরাদ্দ উপযোগী শিল্প প্লটের অভাব ও নতুন কারখানা ভবনে গ্যাস সংযোগের অভাব।
- **চ্যালেঞ্জ:** মীরসরাই এ অবস্থিত বেপজা ইকোনমিক জোনের উন্নয়ন ও এটিকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে কার্যক্ষম করা।

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ এর মাধ্যমে ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিডা দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে কাজ করে যাচ্ছে। বিডা'র চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

বাংলাদেশে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির কার্যক্রম

শিল্প করিডোর

- বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে শিল্প করিডোর স্থাপনের লক্ষ্যে কৌশলগত কর্ম পরিকল্পনা (Strategic Action Plan) তৈরি করেছে বিডা। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে শিল্প করিডোর স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibility Study) করা হবে।

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

➢ উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প-

অনলাইন ওয়ানস্টপ সার্ভিস এর মাধ্যমে বিনিয়োগ সেবা প্রদান

One Stop Service এর মাধ্যমে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি আইন পাশ হয়। পরবর্তীতে ২০১৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারিতে অনলাইন ওয়ানস্টপ সার্ভিস (ওএসএস) সেবা প্রদান শুরু করে বিডা। যার প্রধান উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। বর্তমানে ৩৫টি প্রতিষ্ঠানের ১৫৪টি সেবা পর্যায়ক্রমে বিডার ওয়ানস্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করছে বিডা এবং ১৬টি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

এর মাধ্যমে-

- ✓ একটি নির্দিষ্ট স্থান হতে বিনিয়োগ সংক্রান্ত বড় ধরনের সেবা দেয়া যাবে।
- ✓ বয়লার সার্টিফিকেটসহ ২৭ ক্যাটাগড়িতে ১২৪টি সেবা এক জায়গায় পাওয়া যাবে।
- ✓ বর্তমানে যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও বিডাসহ মোট ৭টি প্রতিষ্ঠানের ২১টি সেবা ওয়ানস্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো:

• ভিসা সুপারিশপত্র।	• বিনিয়োগ ছাড়পত্র।	• আমদানি ও রপ্তানি অনুমোদন।
• Work Permit Insurance	• প্রকল্প রেজিস্ট্রেশন ও অনুমোদন ইত্যাদি।	

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ /Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা বিশেষত পশ্চাৎপদ অঞ্চলে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের লক্ষ্যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সে লক্ষ্যে ২০১০ সালে জাতীয় সংসদে 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০' পাশ হয়। বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ আনয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে বিগত সত্তর দশকের শেষার্ধে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা বা ইপিজেড স্থাপনের কার্যক্রম সূচিত হয়। বিগত চার দশকে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকাগুলো দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে সীমিত অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো শুধু রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপনের সীমাবদ্ধতা। এছাড়া, সেবা খাত ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড বিকাশেও অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৬৯ মিলিয়ন। দেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তাদের ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বিগত এক দশক যাবৎ গুণিতক হারে বাড়ছে। এ প্রেক্ষাপটে দেশে আমদানি বিকল্প শিল্পের প্রসার ঘটেছে এবং সেবা খাতেও বিনিয়োগ শক্তিশালী হচ্ছে। এ সকল খাতে দেশীয় শিল্প উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ছে। দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোকে সকল খাতের বিনিয়োগকারীদের উপযোগী করে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ

বেজা'র পরিচিতি

'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০' এর ধারা ১৭ মোতাবেক অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য নভেম্বর, ২০১১ সালে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এর কার্যক্রম নিবিড় তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে অত্র সংস্থাকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতায় ন্যস্ত করা হয়েছে। এ সংস্থার মুখ্য কার্যাবলির মধ্যে দেশের বিভিন্ন এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন, লাইসেন্স প্রদান, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ অন্যতম।

বেজা'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বেজার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেশের অনগ্রসর অথচ সম্ভাবনাময় অঞ্চলে দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উক্ত এলাকাসমূহে শিল্প বিকাশ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বেজা ২০৩০ সাল নাগাদ সমগ্র দেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, এক কোটি লোকের কর্মসংস্থান এবং ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের অতিরিক্ত রপ্তানি বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে বিদেশি সরকারের সাথে জি টু জি ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকারের চুক্তি সম্পাদনের (জি টু জি) সুযোগ রেখে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। অর্থনৈতিক অঞ্চলের ধারণাকে বহুমাত্রিক বিনিয়োগ বান্ধব করার জন্য সংশ্লিষ্ট আইনে সংশোধনী আনা হয়েছে, যাতে বেপজা অথবা পোর্ট অথরিটির মতো সরকারি সংস্থাগুলো অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের সুযোগ লাভ করতে পারে। অধিকন্তু, জোন ডেভেলপারদের বিনিয়োগ ও অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে বিনিয়োগযোগ্য অর্থ ও অভিজ্ঞতার সময়কাল হ্রাস করা হয়েছে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ

বেজা'র কার্যক্রমসমূহ

- অর্থনৈতিক অঞ্চলের জমি চিহ্নিতকরণ, নির্বাচন ও অধিগ্রহণ; -জোন ডেভেলপার নিয়োগ ও অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- অবকাঠামো উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ ও জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণ, উন্নয়ন সম্পন্ন করে বিনিয়োগকারীদের নিকট হস্তান্তর;
- সামাজিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গীকারপূরণকল্পে জাতীয় শিল্পনীতি বাস্তবায়ন করা।

অর্থনৈতিক অঞ্চলের শ্রেণিবিভাগ

- সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ভিত্তিক অর্থনৈতিক অঞ্চল।
- সরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল।
- সরকারি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা কর্তৃক উন্নয়ন ও পরিচালিত অর্থনৈতিক অঞ্চল।
- বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল।
- জি-টু-জি ভিত্তিক অর্থনৈতিক অঞ্চল।

প্রশাসনিক কার্যক্রম

বেজা'র প্রশাসনিক কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে গত দুই বছরের নিম্নোক্ত অগ্রগতি হয়েছে:

- ✓ বেজা সদর দপ্তরের জন্য ৫৮টি পদ কাঠামোতে নতুন করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- ✓ ১১টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য ১২৫টি পদ কাঠামোতে নতুন করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- ✓ বেজা'র নিজস্ব অফিস ভবনের জন্য শেরে-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় ০.৮৬৮ একর জমি বেজা'র অনুকূলে বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে।
- ✓ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৭ প্রণীত হয়েছে এবং তা ১৬ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখে গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।
- ✓ বেজা'র কার্যালয় থেকে সকল অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন কাজ মনিটরিংসহ সংশ্লিষ্ট সকল অফিসের সাথে দ্রুত সংযোগ সাধনের জন্য বেজা কার্যালয়ে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।
- ✓ বেজা'র নিজস্ব জমিতে প্রধান কার্যালয় ভবন না হওয়া পর্যন্ত দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের নিকট ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে প্রায় ২২০০০ বর্গফুট ভাড়াকৃত অফিস স্পেসে বেজা'র কার্যালয় স্থানান্তর করা হয়েছে ।

BEZA ও BEPZA এর মধ্যে পার্থক্য

BEZA	BEPZA
বেজা বা বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানি বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর এলাকাসহ সকল এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।	বেপজা বা বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদেশি পুঁজি আকর্ষণ, দ্রুত শিল্পায়ন, স্থানীয় জনশক্তির জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, প্রযুক্তি হস্তান্তর ত্বরান্বিতকরণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন বৃদ্ধির জন্য রপ্তানি সম্প্রসারণ। একই সঙ্গে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতা, উচ্চ বেকারত্ব, মূলধরনের স্বল্পতা, অপর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব মোচনও বেপজার অন্যতম লক্ষ্য।
বেজার উৎপাদিত পণ্যের বাজার শুধু বহির্বিশ্ব নয় বরং স্থানীয় বাজারও। অর্থাৎ বেজার উৎপাদিত পণ্য শুধু রপ্তানির উদ্দেশ্যে নয় বরং স্থানীয় বাজারের চাহিদাও মেটাবে।	বেপজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইপিজেডে উৎপাদিত পণ্যের বাজার হচ্ছে বহির্বিশ্বে অর্থাৎ ইপিজেডে শুধু রপ্তানির উদ্দেশ্যে পণ্যে উৎপাদন করা হয়।

BEZA ও BEPZA এর মধ্যে পার্থক্য

BEZA	BEPZA
বেজা পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চায়।	বেপজা বিশেষ এলাকা বা সুবিধাজনক স্থানে ইপিজেড স্থাপন করে দেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ করতে আগ্রহী।
বেজার কার্যাবলি হচ্ছে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা, লাইসেন্স প্রদান, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ করা।	বেপজার কাজ হচ্ছে দেশি বিদেশি বিনিয়োগের লক্ষ্যে নতুন ইপিজেড তৈরি, শিল্প বিনিয়োগের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি, নতুন শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখা, শিল্প মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক, নিরাপদ ও শ্রম অধিকার সমুন্নত রেখে নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদনমুখী কর্মপরিবেশ সৃষ্টি এবং শিল্পায়নের উদ্দেশ্যে ইপিজেডসমূহে নতুন প্রযুক্তি আনয়নে বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করা।

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SPECIAL ECONOMIC ZONES)

- ২০৩০ সালের মধ্যে হবে- ১০০টি; ১ কোটি কর্মসংস্থান হবে BEZA কর্তৃক।
- অনুমোদন পেয়েছে- ৯৭টি
- উৎপাদনে আছে- ০৯টি
- উন্নয়ন কাজ চলমান- ২৮টি
- ইতোমধ্যে কর্মসংস্থান হয়েছে- ৪০ হাজার
- আরো কর্মসংস্থান হবে – ৮ লাখের
- ইতোমধ্যে বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে – ২৭.০৭ বিলিয়ন ডলার (২১০ জন বিনিয়োগকারী)
- বৃহত্তম SEZ- বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর
- **One Stop Service:** এটি হলো আন্তর্জাতিক মানের অনলাইন সেবা। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA) ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পরীক্ষামূলকভাবে ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করেছে। মোট ৪১টি সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়াও, বাংলাদেশ প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (BEZA) ১২৫টি অনলাইন সেবা প্রদান করছে।
- **Ease Doing Business 2020:** বাংলাদেশের অবস্থান ১৯০টি দেশের মধ্যে ১৬৮তম।

ই-গভর্নেন্স

সুশাসন প্রতিষ্ঠার আধুনিকতম একটি উদ্যোগ হল ই-গভর্নেন্স। ই-গভর্নেন্স হল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সরকারি সেবা সমাজের সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থায় একজন নাগরিক স্বল্প ব্যয়ে, ঝামেলাবিহীনভাবে সপ্তাহে সাত দিন; দিনে চব্বিশ ঘণ্টা সরকারি সেবা পেতে পারে। এর ফলে শাসন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা আসে, দুর্নীতি হ্রাস পায়। এভাবে মূলত সুশাসনই নিশ্চিত হয়।

বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত একটি প্রত্যয় হচ্ছে ই-গভর্নেন্স। বর্তমান পৃথিবীর উন্নত-অনুন্নতসহ বেশিরভাগ রাষ্ট্রেই ই-গভর্নেন্স এর বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসারের ফলে সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এর প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখন ইচ্ছে করলে এক মূহুর্তে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে যোগাযোগ ও তথ্য প্রেরণ করা যায়। ই-গভর্নেন্স এর শাব্দিক অর্থ হল ইলেকট্রনিক গভর্নেন্স বা ইন্টারনেট ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা; অর্থাৎ সরকারি সেবা ও সুযোগ-সুবিধা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাওয়া। এর ফলে জনগণের সময়, অর্থ ও শ্রমের সাশ্রয় হয়। ই-গভর্নেন্স সম্পর্কে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণের মতামত উল্লেখ করা হলো:

জে.সাফরিজ এবং ই-রাসেল (J Shafriz এবং E Russel) এর ভাষায়, "যে সরকার ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনগণকে সরকারি তথ্য সরবরাহ করে এবং জনগণ ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরকারকে যাবতীয় সরকারি বিল বা অন্যান্য পাওনা পরিশোধ করে সে সরকারই ই-সরকার।"

ই-গভর্নেন্স

বিশ্বব্যাংকের সংজ্ঞায় "ই-সরকার হচ্ছে সরকারের বিভিন্ন এজেন্সি কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে নাগরিক, ব্যবসায় খাত এবং অন্য সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক পুনঃনির্ধারণ করা।"

সাধারণত তিনটি স্তরে বা পর্যায়ে এই ই-গভর্নেন্স সেবা পাওয়া যায়-(১) সরকার ও সেবা গ্রহীতা (ব্যক্তি), (২) সরকার ও ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং (৩) সরকার থেকে সরকার। বাংলাদেশ সরকার সব ধরনের সরকারি সেবা জনগণের দ্বারে পৌঁছে দেবার জন্য স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তর ইউনিয়ন পরিষদে একটি ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র বা ডিজিটাল সেন্টার চালু করেছে। তাছাড়া সরকারি সকল কার্যালয় থেকে দ্রুত তথ্য পাওয়ার জন্য একজন করে তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। দ্রুত তথ্য পাওয়ার জন্য প্রত্যেকটি সরকারি কার্যালয়ের মৌলিক কিছু তথ্য ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্তকরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠিত হলে সর্বাগ্রে প্রাধান্য পাবে সাধারণ নাগরিক। এটি চার ধরনের কাজ করে যার কেন্দ্রে থাকে নাগরিক সেবা। এ কাজগুলো হচ্ছে ব্যক্তিকে অবগতকরণ, ব্যক্তিকে প্রতিনিধিত্বকরণ, ব্যক্তিকে পরামর্শ প্রদান এবং ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্তকরণ।

ই-গভর্নেন্স

ই-গভর্নেন্সের উদ্দেশ্য

দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে ই-গভর্নেন্সের লক্ষ্য। ই-গভর্নেন্স সর্বস্তরের মানুষের কাছে সরকারি সেবা পাবার একটি জানালা উন্মোচন করে দেয়। ই-গভর্নেন্স সরকার ও জনগণের মধ্যে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ, গ্রহণযোগ্য এবং দক্ষ আন্তঃসম্পর্ক সৃষ্টি করে। ই-গভর্নেন্স অধিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে এবং ব্যয় সাশ্রয়ী ও উচ্চমানের জনকল্যাণের প্রতিফলন ঘটায়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের ৪,৫৪৭টি ইউনিয়ন পরিষদে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ২০০৯ সালে ৩০টি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে এর যাত্রা শুরু হয়। এই সেন্টারগুলোর মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে যে সকল সেবা দেওয়া হয় সেগুলো হচ্ছে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, সরকারি ফর্ম ডাউনলোডের সুবিধা, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ, অনলাইনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত কাজ, ভিজিডি, ভিজিএফ কার্ড সংক্রান্ত তথ্য, জীবনধারণ সংক্রান্ত তথ্য, চাকুরি সংক্রান্ত তথ্য, ভিসা প্রক্রিয়াকরণ ও ফর্ম সংগ্রহ, ই-মেইল ও ইন্টারনেট ব্রাউজিং, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ভিডিও কনফারেন্সিং, মোবাইল ব্যাংকিং, ব্রিটিশ কাউন্সিল কর্তৃক ইংরেজি শিখন, ফটোকপি, স্ক্যানিং, ফটো তোলা এবং মোবাইল ফোন সেবা।

Facebook + Youtube

ই-গভর্নেন্স

নিম্নে ই-গভর্নেন্সের উদ্দেশ্যসমূহ বিশদভাবে আলোচনা করা হল:

- জনস্বার্থে সরকারের প্রত্যেকটি তথ্য সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া ই-গভর্নেন্সের মৌলিক উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে একটি।
- সরকার ও জনগণের মধ্যে সহযোগিতাময় কাঠামো তৈরি করা ই-গভর্নেন্সের লক্ষ্য। জনগণের কাছ থেকে সাহায্য বা পরামর্শ গ্রহণ এবং তাদের সমস্যা সম্পর্কে সরকারকে ওয়াকিবহাল করাই এর অন্যতম উদ্দেশ্য।
- শাসন প্রক্রিয়ায় সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণকে সরাসরি অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহ সৃষ্টি করাও ই-গভর্নেন্সের উদ্দেশ্য।
- ই-গভর্নেন্স দেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ইলেকট্রনিক মাধ্যমগুলোর উন্নতি সাধন করে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকার, জনগণ এবং ব্যবসা খাতকে আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বুদ্ধিভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে সহায়তা প্রদান করা।
- জনগণের কাছে সরকারি সকল তথ্য ও উপাত্ত সহজলভ্য করার মাধ্যমে শাসন প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছতা প্রদান করার একটি উদ্দেশ্য ই-গভর্নেন্স বহন করে। এভাবে জনগণ সরকারের সিদ্ধান্ত ও নীতি সম্পর্কে সহজে জানতে পারে।
- সরকার তার গৃহীত প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কে জনগণের কাছে জবাবদিহি করায় দায়বদ্ধ। স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা ও জনগণকে অধিক জ্ঞাত করার মাধ্যমে সরকারকে পূর্বের চেয়ে আরও বেশি জবাবদিহিমূলক পরিণত করা ই-গভর্নেন্সের উদ্দেশ্য।
- তথ্য ও সেবা প্রদানের খরচ কমিয়ে শাসন পরিচালনায় ব্যয় হ্রাস করা ই-গভর্নেন্সের উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে স্টেশনারি উপাদানের খরচ কমানো যায়, যা সরকারি ব্যয়ের একটি বড় অংশ। এছাড়া ই-গভর্নেন্স যোগাযোগ ক্ষেত্রে ব্যয় অনেক হ্রাস করে। কারণ সরাসরি কোন স্থানে পৌঁছে যোগাযোগের চেয়ে ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ সময় ও খরচ অনেকাংশে কমিয়ে দেয়।
- যেহেতু জনগণের জন্য সরকার তাই জনগণের তদন্ত ও সমস্যাবলির জবাবে সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ ও সমাধান সরবরাহ একান্ত জরুরি। ই-গভর্নেন্স জনগণের প্রতি সরকারের প্রত্যুত্তর ও প্রতিক্রিয়ার সময় অনেকাংশে কমিয়ে নিয়ে আসে। মোটের উপর, আধুনিককালে ই-গভর্নেন্স সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম মাধ্যম বা প্রক্রিয়া হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

ই-গভর্নেন্স

ই-গভর্নেন্সের গুরুত্ব

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্সের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে ই-গভর্নেন্স এর গুরুত্ব উল্লেখ করা হল–

- তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জন্য ই-গভর্নেন্স অপরিহার্য। এর মাধ্যমে সরকারি সেবা যেমন জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া সম্ভব, তেমনি সম্ভব সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা ও সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন। সরকার পরিচালনায় ব্যয় হ্রাসকরণসহ দুর্নীতি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব ই-গভর্নেন্স প্রবর্তনের মাধ্যমে।
- উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার এখন তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে অর্থ আদান-প্রদান, প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ, কর সংগ্রহ, লাইসেন্স প্রদানসহ নানা সুবিধা নাগরিকদের সরবরাহ করে চলেছে। স্বল্পোন্নত একটি দেশ হিসাবে বাংলাদেশেও এর প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।
- সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় করে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য ই-গভর্নেন্সের কোন জুড়ি নেই। এর ফলে সরকারের কাজকর্মে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা দুই-ই বৃদ্ধি পায়।
- উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত অনেক দেশের সরকার খরচ করে বেশি, কাজ করে কম এবং তারা জবাবদিহিমূলকও নয়। ই-গভর্নেন্স এসব সীমাবদ্ধতাগুলোকে দূর করতে সহায়তা করে। সুশাসনে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করে অনেক দেশই লক্ষণীয় সফলতা অর্জন করেছে। উদাহরণস্বরূপ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশ তাদের শাসনব্যবস্থাকে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করায় সক্ষম হয়েছে।
- নাগরিক ও সুশীল সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেক সময় সাধারণ জনগণও সরকারি তথ্য আদান-প্রদান ও মতামত দিয়ে সরকারকে অধিকতর সহযোগিতা করতে পারে। অর্থাৎ ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।
- ই-গভর্নেন্সের ফলে সরকারি কাজে দুর্নীতির প্রকোপ কমে যায়। ফিলিপাইন ই-গভর্নেন্সের সফল প্রয়োগে সরকারি কাজে দুর্নীতি হ্রাসে অনেকটাই সক্ষম হয়েছে।

ই-গভর্নেন্স

ই-গভর্নমেন্ট ও ই-গভর্নেন্সের পার্থক্য

বিষয়	ই-গভর্নমেন্ট	ই-গভর্নেন্স
অর্থ	সরকারি কার্যক্রম, সচেতন নাগরিকদের সহায়তা ও সেবা সরবরাহের লক্ষ্যে আইসিটির প্রয়োগকে ই-সরকার বা ই-গভর্নমেন্ট বলা হয়।	ই-গভর্নেন্স বলতে জনগণের কাছে বিতরণ করা তথ্য ও সেবার পরিসর এবং মান বাড়ানোর ক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহারে কার্যকর পদ্ধতিকে বোঝায়।
এটা কি	পদ্ধতি	কার্যকারিতা
যোগাযোগ নীতি	একমুখী যোগাযোগ প্রোটোকল	দ্বিমুখী যোগাযোগ প্রোটোকল

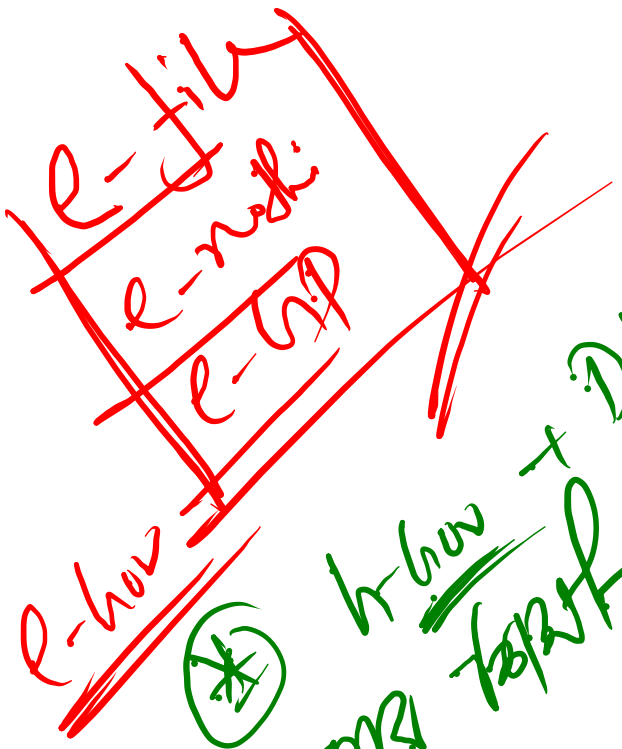

e-file
e-nothi
e-GP
e-gov

✻ h-gov + Digital

বাংলাদেশের [illegible] কাঠামোর ও কৌশল প্রণয়ন এবং [illegible] (৩য় সংশোধিত)

↓ ২৩/১২/২০১৪ →

জু-২০২৫ - জুন ২০৩০

১৮০

৬৯৭ : ৭৭৭৫ কোটি টাকা

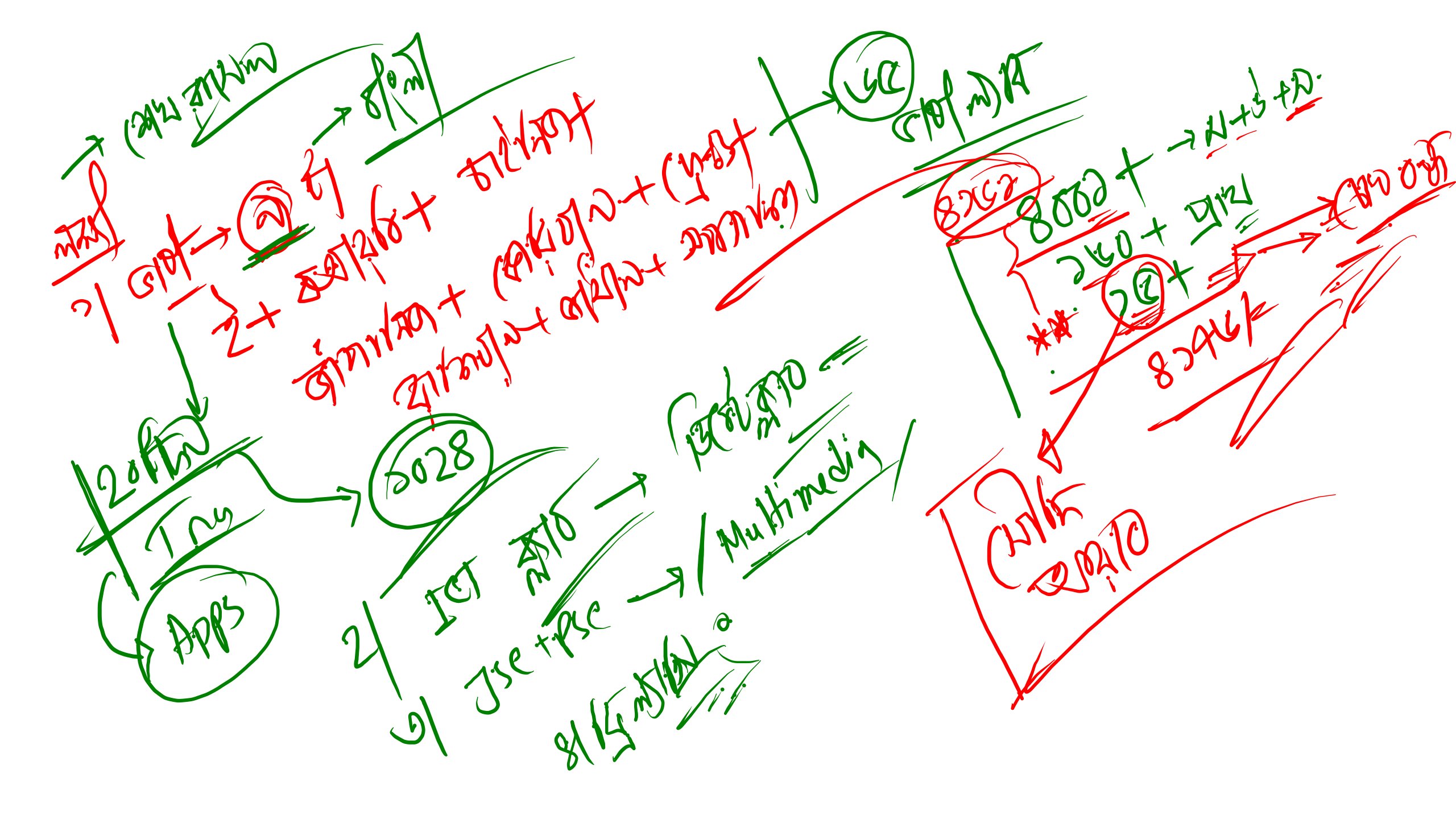

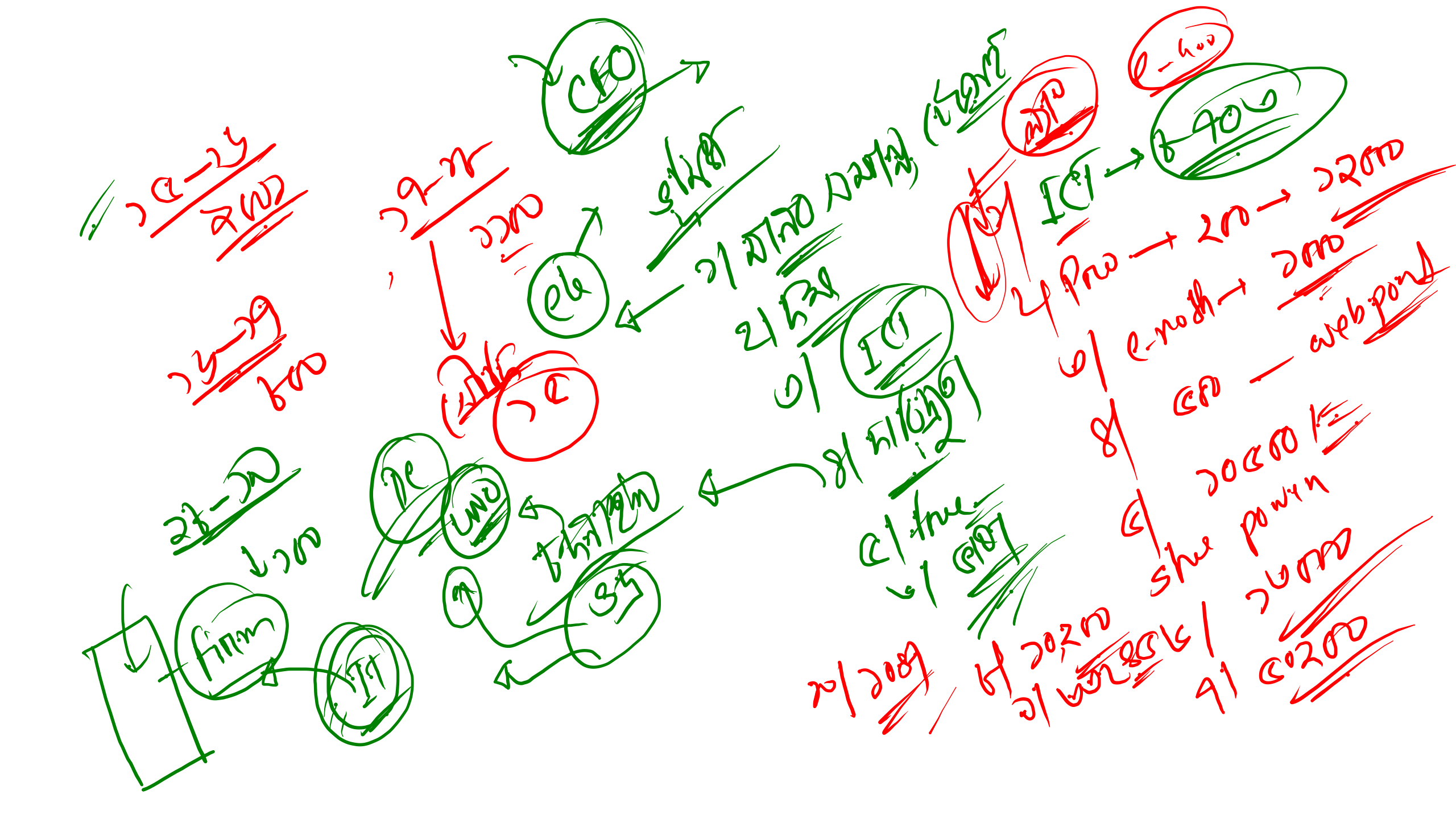

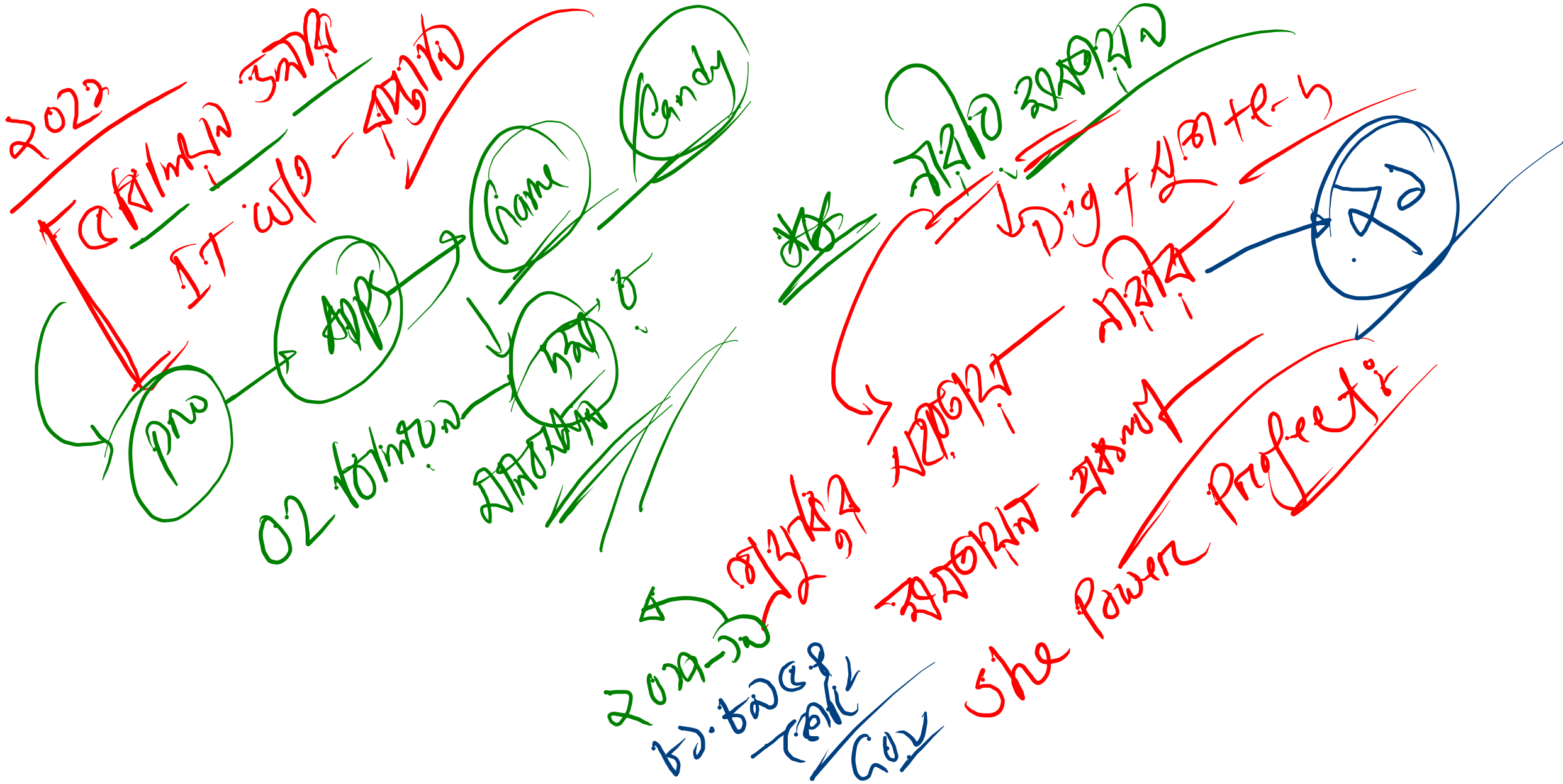

2022
IT
Pro
Apps
Game
Candy
02
Dig
Gov
She Power Project

মন্ত্রণালয়: —> ০৩০০০

(1) Freelancer to ... 800

(2) IT sen. prov 800

(3) Women call center 2000

১ — ৩.৫০
২ — ৩ "
৩ — ১২৮

ই-গভর্নেন্সের চ্যালেঞ্জসমূহ

- দিম্পি শ্রীবাস্তব এবং কে শর্মা (২০১০), ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হিসেবে ভৌগোলিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন। নিরক্ষরতা ও অবকাঠামোগত সংকটের কারণেও ই-গভর্নেন্সের সফলতার সম্ভাবনা কমে যায়।
- উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নাগরিক বিপুল অংশের মধ্যে সচেতনতার অভাব থাকায়, তারা ই-গভর্নেন্সের সুবিধা গ্রহণে এখনো অক্ষম। অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সরকারি পোর্টালে এখন প্রায় ৬৫টি সেবার ফরম পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণ জনগোষ্ঠীর অনেকেই এ সম্পর্কে অবগত নয়।
- জোসেফ বাউলিয়া (২০০৯) এর মতে, ই-গভর্নেন্সের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধক হচ্ছে বাজেট এবং প্রশিক্ষণের অভাব। বাংলাদেশেও এ সমস্যাগুলো প্রকট। উল্লেখ্য ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ দুই হাজার কোটি টাকার অধিক অর্থ প্রস্তাব করলেও, অর্থ মন্ত্রণালয় তার অর্ধেক বরাদ্দ করতে পেরেছে।
- বাংলাদেশের মত অনেক দেশে ই-গভর্নেন্স যথাযথভাবে কার্যকর করার পথে একটি প্রধান অন্তরায় বিদ্যুৎ সংযোগ ও বিদ্যুৎ ঘাটতি। বর্তমানে তিন-চতুর্থাংশ জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করলেও এখন অবধি বিপুল জনগোষ্ঠী এই আওতার বাহিরে। তাছাড়া পল্লি অঞ্চলে ঘনঘন লোডশেডিং ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ভোল্টেজ কম হবার কারণে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহার বাধাগ্রস্ত হয়।
- বাংলাদেশের মত দেশে ই-গভর্নেন্সের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বাঁধা হচ্ছে ইন্টারনেটের ধীর গতি ও উচ্চমূল্য। বাংলাদেশে মাত্র ১০ ভাগের বেশি সংখ্যক মানুষের ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা রয়েছে।
- ব্যক্তি পর্যায়ে ই-গভর্নেন্সের সুবিধা পেতে হলে নিজস্ব কম্পিউটার থাকা জরুরি, যা দরিদ্র জনগণের পক্ষে সম্ভবপর হয় না।
- কম্পিউটারের সার্ভার তথ্য ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে বিধায়, প্রযুক্তিগত কারণে এ সার্ভারের কার্যক্রমে ত্রুটি দেখা দিলে রাষ্ট্রীয়, সরকারি ও ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হবার আশঙ্কা থাকে, যা ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকারের পরিপন্থি।
- প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামোর অভাবে অনেক সময় ই-গভর্নেন্স চালুকরণের উদ্যোগ বাধাগ্রস্ত হয়।

ই-গভর্নেন্সের চ্যালেঞ্জ দূর করার উপায়

ই-গভর্নেন্স হচ্ছে সরকার কর্তৃক আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (যেমন- ইন্টারনেট, স্থানীয় এলাকা নেটওয়ার্ক, বিস্তৃত এলাকা নেটওয়ার্ক এবং মোবাইল ফোন) মাধ্যমে নাগরিকদেরকে উন্নত এবং দক্ষতার সাথে সরকারি সেবা প্রদান করা। কিন্তু এ সেবা প্রদানে অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ই-গভর্নেন্স প্রচলনের অন্তরায় দূর করার জন্য নিম্নলিখিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

- ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি করা দরকার। এই কাঠামোটি সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে জনগণকেন্দ্রিক ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা করবে। এছাড়াও এরকম একটি কাঠামোর মাধ্যমে ই-গভর্নেন্সের সার্বিক কর্মকাণ্ডের ওপর তত্ত্বাবধান করা সম্ভবপর হবে।
- বাংলাদেশের মতো দেশে ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা রক্ষার বিধান যুক্ত করে, ২০০৯ এর ICT Act সংশোধন করতে হবে। ২০০৯ সালের RTI Act এর যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। এই Act এর বাস্তবায়নের ভিত্তিতে জনগণের তথ্য অধিকার প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত হবে।
- ই-গভর্নেন্স সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশেষ করে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়েবসাইটে কি ধরনের সেবা প্রদানের তথ্য রয়েছে তা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা উচিত।
- এই সুবিধা দেশের সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হলে, এর জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
- বাংলাদেশের মতো দেশে কেবল ই-গভর্নেন্স এর প্ল্যাটফর্ম ও সুবিধা তৈরি করলেই হবে না, বরং তা ব্যবহারের মতো ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিও সৃষ্টি করতে হবে।

সর্বোপরি জনগণকে ই-গভর্নেন্স ব্যবহারে প্রস্তুত করা (e-readiness) এবং জনগণের মধ্যে ডিজিটাল বৈষম্য (digital divide) হ্রাসকরণে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

আধুনিক সভ্যতার এই বিশ্বায়নের যুগে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বত্র। শিল্প বিপ্লবের পর তথ্যপ্রযুক্তিতে দ্রুত উন্নয়ন লাভ পৃথিবীতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা । তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অনন্য উন্নতির ফলে গোটা বিশ্ব আজ গ্লোবাল ভিলেজে রূপান্তরিত হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি দূরত্বকে কমিয়ে সহজলভ্য করেছে সবকিছু, অপরিচিতকে করেছে পরিচিত, আর অসাধ্যকে সাধন করেছে। তথ্যপ্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বের সকল প্রকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল হাতিয়ার।
কম্পিউটার এবং টেলিযোগাযোগ মাধ্যমে সকল প্রকার তথ্য সংগ্রহ, একত্রীকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবস্থাপনা এবং বিতরণের জন্য ব্যবহৃত সকল প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিকে তথ্যপ্রযুক্তি বলা হয়। কম্পিউটিং, মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন ইত্যাদি তথ্যপ্রযুক্তির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বিষয়গুলোর মধ্যে পরে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিকাশের ফলে সারাবিশ্ব প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে পড়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এসেছে নতুন নতুন সুযোগ ও সম্ভাবনা। বর্তমানে কৃষি থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, অফিস-আদালত দেশের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি তার স্পর্শ রাখেনি। এর ছোঁয়ায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দিন দিন বেড়েই চলেছে। নিচে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

- **বিনিয়োগ:** ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য বিনিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে অর্থনৈতিক লেনদেন সহজে ও দ্রুত সম্পন্ন করা যাচ্ছে। মানুষের বিনিয়োগ ক্ষমতা ও সুযোগ বেড়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে কম সময়ে বিনিয়োগ করা এবং অপরদিকে বিনিয়োগ সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

- **কর্মসংস্থান:** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিকাশের ফলে নতুন ধরনের পেশা ও সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষত আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে অনেক শিক্ষিত তরুণের কর্মসংস্থান হচ্ছে। ফলে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে।
- **আউটসোর্সিং:** কোন প্রতিষ্ঠানের কাজ নিজেরা না করে তৃতীয় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে করিয়ে নেওয়াকে আউটসোর্সিং বলে। কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা এখন দেশের শিক্ষিত সমাজের জন্য আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তিতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এখন এসব মার্কেটপ্লেসে নিজের পছন্দ মতো কাজগুলো খুঁজে নিচ্ছে।
- **ব্যবসায় উদ্যোগ:** অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নতুন উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ। একটি উদ্যোগ বদলে দিতে পারে একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি। তথ্য প্রযুক্তির সফল ব্যবহার উদ্যোক্তা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। মোটকথা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নতুন উদ্যোগের অপর সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।
- **উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি:** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে কম জনশক্তি দিয়ে অধিক কাজ করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে কর্মী প্রতি ব্যয় কমেছে, তদুপরি কর্মীদের কাছ থেকে অনেক বেশি কাজ পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। বিনিয়োগ কম লাগছে এবং কর্মী ব্যবস্থাপনা সহজ হয়েছে। এতে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রভূত ভূমিকা রাখছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

- **ক্ষুদ্র ব্যবসায়:** অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ব্যবসার ভূমিকা ব্যাপক। বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেবা নিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। নতুন নতুন ব্যবসার দ্বার উন্মোচন হচ্ছে। ব্যবসায়ের ধরন অনলাইন কিংবা অফলাইন যে কোনোটাই হতে পারে।
- **যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন:** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে যোগাযোগ ক্ষেত্রে। পূর্বে যোগাযোগের জন্য হয়তো মাসের পর মাস লেগে যেত, সেটা এখন নিমেষেই করা সম্ভব হচ্ছে। বড় বড় ফাইল এখন মুহূর্তের মধ্যেই ট্রান্সফার করা সম্ভব হচ্ছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ গ্রাম ও শহরের ব্যবধান কমিয়ে এনেছে। সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়ে এসেছে গতিশীলতা, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।
- **শিক্ষা বিস্তার:** শিক্ষা হলো একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি তথ্যকে মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে গেছে। ডিজিটাল ক্লাসরুমে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করছে। অনলাইনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা, পরীক্ষা দেয়া কিংবা শিক্ষামূলক বিভিন্ন ওয়েবসাইট হতে শিক্ষা লাভ করা যায়। আর ইন্টারনেট ও কম্পিউটার প্রযুক্তির সাহায্যে ঘরে বসে শিক্ষা দেওয়া ও নেওয়ার এই পদ্ধতিটাকে ই-লার্নিং বলে।
- **ই-গভর্নেন্স:** তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়নের ফলে সরকারি সেবাসমূহ কম্পিউটারাইজড ও অনলাইনভিত্তিক হচ্ছে। এতে সরকারের নাগরিক সুবিধা জনগণ সহজেই নিতে পারছে এবং সরকারের জবাবদিহিতা বাড়ছে। দেশের উন্নয়নের জন্য বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর ই-গভর্নেন্স চালুর মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের মধ্যে কাজের সুসমন্বয় ঘটানো যায়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

- **ই-কমার্স:** ই-কমার্স হচ্ছে অনলাইন যোগাযোগ ব্যবস্থার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনাময় দিক। পণ্য কেনাবেচা ও আর্থিক লেনদেনের ইলেকট্রিক সংস্করণ-এর ফলে অর্থনৈতিক লেনদেন ও বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় উদ্যোগের পথ সুগম হচ্ছে। ব্যাপক বাণিজ্যিক কার্যক্রম এখন অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে। ইন্টারনেট বা অন্য কোন কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পণ্য বা সেবা ক্রয়-বিক্রয় করাকে ই-কমার্স বলে।

- **ই-কৃষি:** কৃষি উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। কৃষি বিষয়ে তথ্য, গবেষণা ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে তথ্য প্রযুক্তি বিশেষ ভূমিকা রাখছে। আবহাওয়া, ফসল বপন ও পরিচর্যা, সার ও কীটনাশক প্রয়োগের তথ্য, রোগবালাই দমন ইত্যাদি কৃষিতথ্য অনলাইনের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে কৃষকরা জানতে পারছে। কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষকরা সচেতন হচ্ছে, যা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সহায়তা করছে।

- **ই-ব্যাংকিং:** একটি দেশের আর্থিক কর্মকাণ্ডের মূল চালিকাশক্তি ব্যাংক ব্যবস্থা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়নের ফলে ব্যাংকিং খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও লেনদেন তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর হওয়ায় ব্যাংকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

- **মোবাইল ব্যাংকিং:** দেশে মোবাইল ফোন নির্ভর ব্যাংকিং সেবা চালু হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী যাদের স্বাভাবিক ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের সুযোগ নেই, তাদের জন্য সে সেবার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। নিরাপদ ও সহজ আর্থিক লেনদেন সুবিধার কারণে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। অর্থ প্রেরণ ও গ্রহণের ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিং একটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে পরিণত হয়েছে।

- **নারী উন্নয়ন:** তথ্য প্রযুক্তি নারী উন্নয়নে রাখছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা । তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে ঘরে ঘরে তথ্য পৌঁছে যাচ্ছে। ফলে ঘরে বসেই নারীরা বিভিন্ন বিষয় জানতে পারছে, যা তাদেরকে অধিকার বিষয়ে সচেতন করে তুলছে। সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে নতুন কর্মসংস্থানের।

- **পরিবেশ সংরক্ষণ:** পরিবেশ সংরক্ষণ ছাড়া কোনো উন্নয়নই টেকসই হয় না। তাই উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে পরিবেশের বিষয়টিও বিবেচনা করতে হয়। তথ্য প্রযুক্তি পরিবেশ সংরক্ষণেও অবদান রাখছে। তথ্য প্রযুক্তি পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন উদ্যোগেরও সুযোগ সৃষ্টি করছে তথ্য প্রযুক্তি।

আইসিটি খাতের অগ্রগতি

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক

দেশে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক/ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করছে। এছাড়াও দেশের বিপুল যুবশক্তির কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির জন্যও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসব উদ্যোগ এসডিজি (SDG) লক্ষ্যমাত্রা, পঞ্চবার্ষিকী লক্ষ্যমাত্রা ২০১৮ এর নির্বাচনী ইস্তেহারের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে। বর্তমানে সারাদেশে ৩৯টি হাই-টেক পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল পার্কে ফাইবার অপটিক লাইন, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানির সরবরাহ ব্যবস্থা, সুয়্যারেজ লাইন, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, সংযোগ সড়ক, সড়ক বাতিসহ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভবন/বিজনেস স্পেস নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে কালিয়াকৈরে 'বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি', যশোরে 'শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক', নাটোরে 'শেখ কামাল আইটি ইনকিউবেশন এন্ড ট্রেনিং সেন্টার এবং ঢাকায় জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক'সহ বিভিন্ন পার্কে ১৩.১৫ লক্ষ বর্গফুট স্পেস নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

আইসিটি খাতের অগ্রগতি

প্রযুক্তিভিত্তিক উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা

আইটি শিল্পের জনবলের চাহিদার দিক বিবেচনা করে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে ৫৯,৬৮০ জন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ১,০০,০০০ তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করছে। বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে ১৫,৩৬০ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইটি শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেতু বন্ধন তৈরি করছে। দক্ষমানব সম্পদ তৈরি নিশ্চিত এবং গবেষণার সুযোগ তৈরির জন্য দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ২২টি বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। আরো ১৫টি ল্যাব স্থাপনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। আইটি খাতে মানব সম্পদের চাহিদার প্রেক্ষিতে যোগান নিশ্চিত করা লক্ষ্যে নাটোরে ১টি শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার ও রাজশাহীতে ১টি 'শেখ কামাল আইটি ইনকিউবেটর এন্ড ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করেছে। আরো ১০টি স্থানে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। নতুন উদ্যোক্তাগণ যাতে নতুন আইডিয়া বিকাশের মাধ্যমে উদ্যোক্তা হতে পারে সেজন্য চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর' স্থাপন করা হচ্ছে।

আইসিটি খাতের অগ্রগতি

নতুন প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবসার উদ্যোক্তা তৈরি

নতুন উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ হাই-টেক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। আইটি শিল্পে নতুন উদ্যোক্তা তৈরির জন্য বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পার্কে স্বল্প ভাড়ায় স্পেস/ফ্লোর বরাদ্দ প্রদানসহ বিনা মূল্যে ইন্টারনেট, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য ইউটিলিটি সুবিধা দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ, টেকনিক্যাল সাপোর্টসহ সরকারের অন্যান্য সকল প্রণোদনা সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ইনকিউবেশন সুবিধা দেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১০০টির অধিক স্টার্টআপকে ১ বছর মেয়াদি ইনকিউবেশন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন পার্কে ১ বছর মেয়াদি ইনকিউবেশন সুবিধা প্রদান চলমান আছে।

আইসিটি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি

আইটি খাতের কোম্পানিসমূহ যাতে বিদেশি কোম্পানিগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে সে জন্য তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ হতে ৮১টি কোম্পানিকে আন্তর্জাতিকমানের সার্টিফিকেশন গ্রহণে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। সহায়তাপ্রাপ্ত কোম্পানিগুলোর মধ্যে ৭৬টি (2 CMMIL 5, 21 CMMIL-3 47 ISO 9001. 6 ISO 27001) কোম্পানির সার্টিফিকেশন সম্পন্ন হয়েছে। এসব কোম্পানি দেশে-বিদেশে নিজেদের ব্যবসা সম্প্রসারণ করেছে। হাই-টেক/ সফটওয়্যার পার্কগুলোতে মোট ১২০টির বেশি কোম্পানিকে স্পেস বাজার মূল্যের চেয়ে কম মূল্য হারে ফ্লোর/জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ফলে হাই-টেক পার্কসমূহে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও, পার্কে নারী উদ্যোক্তাদের স্পেস বা জমি বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯

তথ্য অধিকার আইন সাধারণত জনগণের তথ্য পাওয়ার স্বাধীনতা সংক্রান্ত আইন নামে পরিচিত, একে বলে উন্মুক্ত তথ্য। যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের আইন আলোকিত আইন নামে পরিচিত। কিছু কিছু দেশে এ আইনের শিরোনাম হলো তথ্য স্বাধীনতা আইন। প্রাপ্ত তথ্যসূত্রে জানা যায় যে, এ ধরনের আইন বিভিন্ন শিরোনামে পৃথিবীর ৭০টি দেশে প্রচলিত। ১৭৬৬ সালে প্রথম সুইডেনে এ ধরনের আইন প্রবর্তিত হয় যা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আইন নামে পরিচিত। তথ্য অধিকার সংক্রান্ত এ আইনটিই প্রাচীনতম আইন বলে সাধারণভাবে স্বীকৃত। একাধিক অঙ্গরাজ্য নিয়ে গঠিত উন্নত রাষ্ট্রে ঐ সমস্ত অঙ্গরাজ্যে কেন্দ্রীয় আইন ব্যতীত একই ধরনের পৃথক আইনও প্রচলিত রয়েছে।

সার্কভুক্ত বেশিরভাগ রাষ্ট্রই তথ্য অধিকার আইন প্রবর্তন করেছে। ২০০২ সালে পাকিস্তান তথ্য স্বাধীনতা অধ্যাদেশ বলবৎ করে। ভারতে এ ধরনের আইন ২০০৫ সালে গৃহীত হয় যা তথ্য অধিকার আইন নামে পরিচিত। ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট এই মর্মে অভিমত পোষণ করেছে যে, সংবিধানের আওতায় বাকস্বাধীনতা এবং জীবনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত অধিকার হচ্ছে জনগণের মৌলিক অধিকার এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার এর মধ্যে নিহিত রয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধানেও অনুরূপ অধিকারের স্বীকৃতি বিদ্যমান। যথা, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা। তবে সংবিধানে এ কথাও বলা আছে যে এ ধরনের মৌলিক অধিকারের উপর যুক্তিসংগত বিধিনিষেধ আরোপ করা যায়। ২০০০ সাল থেকে তথ্য অধিকার আইন প্রচলন করার জন্য নাগরিক সমাজ ও মিডিয়া ক্রমাগত দাবি উত্থাপন করার কারণে বাংলাদেশে এ আইন প্রচলিত হয়। নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৮ সালের অক্টোবর মাসের ২০ তারিখে এ সংক্রান্ত অধ্যাদেশ প্রজ্ঞাপন গেজেটের মাধ্যমে জারি করে (অধ্যাদেশ নং ৫০, ২০০৮)।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯

কাঠামোগত ধারণা

ধারণাগত ও ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্য অধিকার আইন মূলত একটি আইনি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকারি তথ্য জনগণকে প্রদান করতে হয়। অনেক দেশেই তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। তবে সুনির্দিষ্ট আইনের অভাবে জনগণ সহজে তথ্য লাভ করতে সক্ষম নয়। কোনো নাগরিক বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যে সংস্থাকে তথ্য দেওয়ার অনুরোধ জানায়, চাহিত তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা সে প্রতিষ্ঠানের উপরই বর্তায়, অন্য কারো উপর নয়। অধিকাংশ দেশে আইনের বিধানে এ বিষয়টি স্বীকৃত। যদি সংশ্লিষ্ট সংস্থা তথ্য প্রদানে অপরাগতা প্রকাশ করে তাহলে এর জন্য উপযুক্ত কারণ জানাতে হয়।

বাক্‌স্বাধীনতা, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে তথ্য প্রাপ্তির অধিকারই এ অধ্যাদেশের প্রারম্ভিক অংশে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ ছাড়া ঐ অংশে এ কথাও বলা হয়েছে যে, জনগণকে অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী করার জন্য এ আইন জরুরি। অধ্যাদেশের ৩৬টি ধারার প্রতিটি এক একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯

এ ধারাসমূহ আটটি অংশে গঠিত –

(১) সংজ্ঞা;
(২) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ, তথ্যপ্রাপ্তি; তবে ২০টি বিষয়ের তথ্য প্রকাশে বাধা আরোপ করা হয়েছে;
(৩) তথ্য প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট কর্মকর্তার নিয়োগ;
(৪) একজন প্রধান তথ্য কমিশনারসহ দুইজন কমিশনার নিয়ে তথ্য কমিশন গঠন,
(৫) কমিশনের তহবিল, বাজেট, আর্থিক স্বাধীনতা, হিসাব নিরীক্ষা;
(৬) কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী;
(৭) তথ্য না প্রদানের অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং
(৮) বিবিধ।

জাতীয় সংসদ কিছু সংশোধনীসহ এ সংক্রান্ত বিল ২০০৯ সালের ৩০ মার্চ অনুমোদন করে। এ আইন ইতিপূর্বে জারীকৃত অধ্যাদেশও রহিত করে। তবে অধ্যাদেশের অধীনে কৃত সকল কর্মকে বৈধতা প্রদান করে।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯

তথ্য কর্মকর্তা: পদ ও দায়িত্ব

এ আইনের বিধানে একজন প্রধান তথ্য কমিশনার (সিআইসি) এবং অন্য দু'জন কমিশনার নিয়োগ করা যায়। এর মধ্যে অন্তত একজন মহিলা হবেন। সিআইসি কমিশনের প্রধান নির্বাহী হবেন। সিআইসি ও অন্য দু'জন কমিশনারকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করবেন। তবে এ সংক্রান্ত বাছাই কমিটির সুপারিশ বিবেচনা করে রাষ্ট্রপতি এ নিয়োগ প্রদান করবেন। তবে বাছাই কমিটি প্রতি পদের জন্য দু'জন ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করবেন। সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটির সভাপতি হবেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের একজন বিচারপতি। কমিটির অন্য চার জন সদস্য হবেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব, সরকারি ও বিরোধী দলের দু'জন সাংসদ যদি সংসদ কার্যকর থাকে, সম্পাদক হওয়ার যোগ্য একজন সাংবাদিক এবং মিডিয়ার সাথে সম্পৃক্ত একজন বিশিষ্ট নাগরিক।

কমিশনে নিযুক্তির জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা সাতষট্টি বছর। নিযুক্তির মেয়াদ সর্বোচ্চ পাঁচ বছর অথবা সাতষট্টি বছর বয়স, যা আগে হবে। সিআইসি ও অন্য কমিশনারদ্বয় মেয়াদান্তে পুনরায় নিযুক্তি লাভের যোগ্য হবেন। কোনো কর্মরত কমিশনারও সিআইসি পদে নিযুক্তি লাভের যোগ্য হবেন। আইন, বিচার, সাংবাদিকতা, শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, তথ্য, সমাজকল্যাণ, ব্যবস্থাপনা বা জনপ্রশাসনে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের এসব পদে নিয়োগ দিতে হবে।

এদের সংশ্লিষ্ট পদ থেকে অপসারণের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অপসারণ সংক্রান্ত বিধান অনুসরণীয়। তবে আইনের দ্বারা নির্ধারিত কয়েকটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি এ বিধান অনুসরণ করতে বাধ্য নন।

সিআইসি ও কমিশনারদের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক, অন্যান্য ভাতা সুবিধাদি সরকার নির্ধারণ করবে। কমিশনের কার্যপরিধি এবং ক্ষমতা আইনে নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রদত্ত কার্যাবলি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কমিশন যেকোনো ব্যক্তিকে হাজির হতে বাধ্য করাসহ কোনো তথ্য বা দলিল সংগ্রহ করতে ক্ষমতাবান। কমিশনের নিজস্ব তহবিল গঠন করার দু'টি উৎস হলো সরকারি অনুদান এবং সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে অন্য প্রতিষ্ঠানের অনুদান। কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতাও রয়েছে। বাজেটে নির্ধারিত খাতের অর্থ সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে ব্যয় করতে কমিশন ক্ষমতাবান। সকল ব্যয় কম্পট্রোলার এবং অডিটর জেনারেল কর্তৃক নিরীক্ষাযোগ্য। কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা কোনোভাবে কম্পট্রোলার এবং অডিটর জেনারেলের অধিকার ক্ষুণ্ন করবে না। আইনের কোনো ধারা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ করলে তাকে জরিমানা করা হবে।

কতিপয় বিষয়ে তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা সংরক্ষণ

সরকারের আটটি গোয়েন্দা সংস্থাকে তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দান করা হয়েছে। এ ধরনের অব্যাহতি মূলত জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থের সাথে সম্পৃক্ত। তবে যে সকল বিষয়ে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে তার তালিকা দীর্ঘ। এর সংখ্যা তেইশটি যা আইনে নির্ধারিত করা হয়েছে। তবে আইনে এ বিধানও রয়েছে যে (ক) কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে অব্যাহতির সিদ্ধান্ত যদি মন্ত্রিপরিষদ অথবা ক্ষেত্রমত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ গ্রহণ করে তাহলে তথ্য প্রকাশ সাময়িকভাবে স্থগিত করার বিষয়ে এর কারণসহ কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং (খ) এ ক্ষেত্রে কমিশনের পূর্বানুমতি বাধ্যতামূলক।

শিল্পায়নের প্রতিবন্ধকতা

➲ **বাংলাদেশে শিল্পায়নের প্রধান প্রধান সমস্যা:** বিগত কয়েক দশকে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো শিল্পে অনেক এগিয়ে গেলেও বাংলাদেশ শিল্পক্ষেত্রে তেমন একটা অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি। শিল্পে বাংলাদেশের এ অনগ্রসরতার পেছনে অনেক কারণ বা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এগুলো হলো:

১. ঐতিহাসিক কারণ
২. পুঁজির অভাব
৩. কাঁচামালের অভাব
৪. দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব
৫. দক্ষ শ্রমিকের অভাব
৬. বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি
৭. রাজনৈতিক অস্থিরতা
৮. অবকাঠামোগত দুর্বলতা
৯. খেলাপি ঋণের বোঝা
১০. আইনশৃঙ্খলাজনিত সমস্যা
১১. শর্তহীন বৈদেশিক সাহায্যের অভাব
১২. চোরাচালান

প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করার উপায়

➲ বাংলাদেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিরাজমান এ সমস্যা যত জটিল বা যত দীর্ঘদিনেরই হোক না কেন, সরকার ও জনগণের সদিচ্ছা থাকলে এর সমাধান তেমন কঠিন কোনো বিষয় নয়। যা হোক, বাংলাদেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ দূরীকরণের উপায়গুলো হলো:

১. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন
২. অবকাঠামো উন্নয়ন
৩. খেলাপি ঋণের বোঝা হ্রাস
৪. সরকারি সহায়তা/পৃষ্ঠপোষকতা
৫. প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার
৬. কাঁচামালের যোগান
৭. বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টি
৮. জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন
৯. দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক
১০. সুষ্ঠু শিল্পনীতি
১১. আমলাতান্ত্রিক জটিলতা
১২. চোরাচালান দমন

চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

অনেকে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (Pressure group), স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী (Interest group), লবি (Lobby), মনোভাব কেন্দ্রিক গোষ্ঠী (Attitude group) এবং সংগঠিত গোষ্ঠীর (Organized group) সমার্থক শব্দরূপে গণ্য করেন। এর ফলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

অ্যালেন পটার চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর পরিবর্তে 'সংগঠিত গোষ্ঠী' (Organized group) শব্দ দু'টি ব্যবহারের পক্ষে। কারণ এ ধারণার মাধ্যমে গোষ্ঠীর সংগঠনের ব্যাপকতাকে আরো যথার্থভাবে অনুধাবন করা সম্ভব।

অ্যালান বলের মতে, "চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হল এমন একটি গোষ্ঠী যার সদস্যগণ 'অংশীদারী মনোভাবের' দ্বারা আবদ্ধ।"

এইচ জিগলার এর মতে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে এমন একটি সংগঠিত ব্যক্তি সমষ্টি যার সদস্যগণ সরকারি ক্ষমতা প্রয়োগে অংশগ্রহণ করে না। বরং তাদের লক্ষ্য হল সরকারি সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করা।

সংক্ষেপে বলতে গেলে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী হল এমন এক দল ব্যক্তির সমষ্টি, যারা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং নিজেদের লক্ষ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকে।

চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের স্বার্থগত ইস্যুগুলোতে একই রকম মনোভাব পোষণ করে। এই গোষ্ঠী নানাবিধ চাপ প্রয়োগ ও কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে তাদের দাবি-দাওয়া আদায় করে। নিম্নে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হল:

- **দলীয় সংগঠনবিহীন:** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এদের কোনো দলীয় সংগঠন নেই। এদের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণ নয়। সরকারের উপরে চাপ প্রয়োগ করে নিজেদের স্বার্থ বা দাবি আদায় করা হচ্ছে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর লক্ষ্য।

- **দলীয় কর্মসূচিবিহীন:** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কোনো রাজনৈতিক দল নয় বিধায় এদের কোনো দলীয় কর্মসূচিও নেই। এটি নির্দলীয় সংগঠন। এরা শুধু গোষ্ঠীর স্বার্থ পূরণের জন্য চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করে।

- **নির্বাচনে প্রার্থী না দেওয়া:** চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী নির্বাচনে প্রার্থী দেয় না এবং নির্বাচনে কোনো প্রার্থীর পক্ষে সরাসরি প্রচারণা চালায় না। তবে অনেক সময় তাদের পছন্দের প্রার্থীকে অর্থ কিংবা জনবল দিয়ে সহযোগিতা করে থাকে। এছাড়াও কোনো কোনো দেশে চাপসৃষ্টিকারী কোনো কোনো গোষ্ঠীকে পছন্দের দলের পক্ষে প্রকাশ্য অবস্থান নিতে দেখা যায়।

চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

- **সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করা:** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্যরা গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে সরকারের কোনো পদে অধিষ্ঠিত হতে চায় না। বরং নানাভাবে সরকারি নীতিকে নিজেদের অনুকূলে আনার জন্য প্রচেষ্টা চালায়।
- **সরাসরি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত নয়:** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সরাসরি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত থাকে না। তবে পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে তাদের যোগাযোগ থাকতে পারে। আর এ যোগাযোগের ভিত্তিতে তারা প্রভাব বিস্তার করে।
- **সমজাতীয় মনোভাব:** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্যরা সাধারণত সমজাতীয় মনোভাব সম্পন্ন হয়ে থাকে। আর এ সমজাতীয় মনোভাবের মূলে রয়েছে তাদের স্বার্থ। কেননা সমজাতীয় মনোভাব সম্পন্ন না হলে তাদের স্বার্থ হাসিলে ব্যর্থ হয়।
- **বেসরকারি সংগঠন:** চাপসৃষ্টিকারী দলের সদস্যগণ বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি বিশেষ। চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর আনুষ্ঠানিক সরকারি স্বীকৃতিও সাধারণত থাকে না।

পরিশেষে বলা যায়, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা সরাসরি না থাকলেও, মূলত রাজনীতিবিদ বা রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততার মাধ্যমেই তারা দাবি বা স্বার্থ হাসিল করে থাকে। এভাবে দেখলে রাজনৈতিক দল না হলেও, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলো পরোক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে।

রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

সাদৃশ্য

রাজনৈতিক দল এবং চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উভয়েই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। উভয়েই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নির্ধারক। উভয়েই রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে নিজেদের দাবি ও মনোভাব ব্যক্ত করে। রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী উভয়ই স্বার্থের সংহতি সাধনের সাথে জড়িত। উভয়েই রাজনৈতিক নিয়োগ বা রাজনৈতিক ভূমিকায় নাগরিকদের অবতীর্ণ করানোর দায়িত্ব বহন করে। রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারা উভয়ের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংরক্ষণ বা পরিবর্তন, গণ-সংযোগ সাধন, তথ্য সরবরাহ, জনমত গঠন, সরকারের সমালোচনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কার্যক্রমে সাদৃশ্য দেখা যেতে পারে। তবে এই দুইয়ের কার্যক্রমের মাত্রা ও গভীরতার মধ্যে পার্থক্য আছে। রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কর্মকান্ড আঞ্চলিক অথবা জাতীয় ভিত্তিতে পরিচালিত হতে পারে।

পার্থক্য/বৈসাদৃশ্য

রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অধ্যাপক অ্যালেন বল, অধ্যাপক নিউম্যান প্রমুখ আধুনিক কালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাজনৈতিক দল ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্যের কথা বলেছেন। উৎপত্তি, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে উভয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য দেখা যায়।

রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

- **লক্ষ্যের ক্ষেত্রে:** সাধারণত বহুমুখী ও ব্যাপক সামাজিক বা জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়। বহু ও বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্ব রাজনৈতিক দলের কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত থাকে। রাজনৈতিক দলের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল বৃহত্তম জাতীয় ও সামাজিক স্বার্থ সাধন। রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সম্প্রসারিত। কিন্তু মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম বাদ দিলে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সামনে বৃহত্তম জাতীয় কল্যাণ সাধনের কোনো মহান উদ্দেশ্য থাকে না। সংকীর্ণ ও সমজাতীয় বিশেষ গোষ্ঠীগত স্বার্থকে কেন্দ্র করে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উৎপত্তি।
- **উৎপত্তিগত ক্ষেত্রে:** সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গড়ে উঠে। এই মতাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় নীতি ও ব্যাপক কর্মসূচি রচিত হয় এবং তা বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা করা হয়। পক্ষান্তরে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে উৎপত্তির ভিত্তিতে কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না। কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অঙ্গীকার থাকে না। এ সমস্ত গোষ্ঠীর অঙ্গীকার থাকে গোষ্ঠীগত স্বার্থ বা কল্যাণের প্রতি।
- **সংহতির প্রশ্নে:** একটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোক থাকতে পারে। তার ফলে দলের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সংহতির প্রশ্ন বড় করে দেখা দেয়। কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সংহতির সমস্যা বড় করে দেখা হয় না। কারণ চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা রাজনৈতিক দলের তুলনায় সাধারণত কম হয় এবং অভিন্ন স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে গোষ্ঠীর সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ থাকে।

রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

- **সাংগঠনিক ক্ষেত্রে:** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর তুলনায় রাজনৈতিক দল অনেক বেশি সংগঠিত ও কাঠামোবদ্ধ। অভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ ও দলীয় শৃঙ্খলার ভিত্তিতে দলীয় সংহতি বজায় রাখার ব্যবস্থা হয়। সাংগঠনিক দিক থেকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী রাজনৈতিক দল অপেক্ষা দুর্বল। দলীয় কর্মসূচির প্রতি অঙ্গীকার ও আনুগত্যের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ প্রদান করা হয়। অপরদিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী মানুষ চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্য হতে পারে।
- **উদ্দেশ্যগত পার্থক্য:** রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য বহুমুখী ও ব্যাপক হলেও, রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসে দলীয় নীতি ও কর্মসূচিকে বাস্তবে রূপায়িত করাই হলো দলের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দল দলীয় সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করে। রাজনৈতিক দল নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করে, দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন করে, নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে সরকার গঠন ও পরিচালনা করে। পক্ষান্তরে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সরকারি সিদ্ধান্তকে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে প্রভাবিত করাই হল চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রধান উদ্দেশ্য।
- **কর্মপদ্ধতির ক্ষেত্রে:** রাজনৈতিক দলের কর্মপদ্ধতি প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ। রাজনৈতিক দলগুলো জনসমর্থন অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ বক্তব্য ও কর্মসূচি সরাসরি জনগণের কাছে পেশ করে। এ কারণে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে জনসাধারণ সহজেই অবহিত হতে পারে। পক্ষান্তরে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কর্মকান্ড পরোক্ষভাবে এবং কখনো-কখনো গোপনে সম্পাদিত হয়। জনসাধারণের সমর্থন অর্জনের ব্যাপারে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর আগ্রহ বা উদ্যোগ বড় একটা দেখা যায় না।

রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

- **সমঝোতার ক্ষেত্রে:** প্রয়োজনবোধে নির্দিষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলের মধ্যে সমঝোতার ঘটনা প্রায়ই ঘটে। বহুদলীয় ব্যবস্থায় সমমনোভাবাপন্ন দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক জোট নিতান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু বিভিন্ন স্বার্থের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এ ধরনের সমঝোতা খুব একটা দেখা যায় না।

- **নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে:** প্রতিটি রাজনৈতিক দল দলীয় প্রার্থীদের নিয়ে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সরাসরি অবতীর্ণ হয়। রাজনৈতিক দলের মুখ্য লক্ষ্য হলো ক্ষমতা দখল করা। কিন্তু চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে না। তবে এই চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলো নিজস্ব স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো দল বা প্রার্থীকে সমর্থন এবং তার পক্ষে প্রচারণা চালাতে পারে।

- **সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে:** কর্মপদ্ধতির প্রকৃতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য দৃশ্যমান। অভিন্ন গোষ্ঠীর স্বার্থের জন্য চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী যে কোনো বিষয়ে সহজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ, জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যুক্ত থাকে বিধায় একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ খুব সহজে সম্ভব হয় না।

রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

- **অপরিহার্যতার ক্ষেত্রে:** আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব অপরিহার্য। কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এ বক্তব্য প্রযোজ্য নয়। সকল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাতে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব খুব একটা দৃশ্যমান হয় না।

- **মতাদর্শের পার্থক্য:** রাজনৈতিক দল ব্যাপক মতাদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। মতাদর্শগত অঙ্গীকার পূরণের জন্য রাজনৈতিক নানাবিধ কর্মসূচি প্রণয়ন করে। কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অঙ্গীকার সাধারণত স্বার্থের প্রতি, রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি নয়। তবে রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলো রাজনৈতিক মতাদর্শকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে পারে না।

পরিশেষে বলা যায়, রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য হল রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন। লক্ষ্য পূরণের জন্য রাজনৈতিক দলের প্রধান কাজ থাকে সদস্য নিয়োগ, নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সরকার গঠন ও পরিচালনা, সরকারের কর্মসূচি নির্ধারণ ও প্রয়োগ। পক্ষান্তরে, চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর লক্ষ্য হল সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করা।

সুশীল সমাজ

সুশীল সমাজ বলতে চাপ সৃষ্টিকারী এক ধরনের গোষ্ঠীকে বোঝায় যারা কোনো ধরনের ক্ষমতাশীল পদে না থেকে সরকারের দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে সচেষ্ট থাকে। বর্তমানে সুশীল সমাজ মানব পুঁজি গঠন, সমাজসেবা এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নাগরিক সংগঠন, পেশাজীবী সংগঠন, NGO, ধর্মভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, সেচ্ছাসেবী সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন, ক্রীড়া সংগঠন, গণমাধ্যম, বিশেষ স্বার্থদল ইত্যাদি সুশীল সমাজের উদাহরণ। বাংলাদেশে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), টিআইবি, মহিলা সমিতি, সুজন ইত্যাদি মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা সংস্থাগুলোও সুশীল সমাজ হিসেবে কাজ করে।

সুশীল সমাজের কার্যাবলি

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সুশীল সমাজ নানাভাবে ভূমিকা পালন করে। যেমন –

- সুশীল সমাজ সরকারি নীতি প্রণয়ন ও পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তার করে।
- আইনসভার সদস্যগণকে প্রভাবিত করে অন্যায় বা গণবিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন থেকে সরে আসতে সুশীল সমাজ বাধ্য করে।
- সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি যেন বিচারক পদে নিয়োগ পায়, নিয়োগ লাভের পর যেন স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচার কাজ সম্পন্ন করতে পারে এজন্য সরকারের ওপর সুশীল সমাজ চাপ সৃষ্টি করে।
- সরকারি নীতি বাস্তবায়ন করার সময় আমলারা যেন গণমুখী আচরণ করতে বাধ্য হন সে পরিবেশ তৈরি করে।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সুস্থ ও সুষ্ঠু জনমত গঠনে সাহায্য করে।
- সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সুশীল সমাজের ভূমিকা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েই চলছে।

বেসরকারি সংস্থা (এন.জি.ও)

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ এন.জি.ও সমূহ

ব্র্যাক

ব্র্যাক (বাংলাদেশ রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি) একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন। জাতীয় পর্যায়ে সারাদেশ জুড়ে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি সংগঠনটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তার কর্মসূচির বিস্তার ঘটিয়েছে। ২১ মার্চ, ১৯৭২ সালে ফজলে হাসান আবেদ সিলেট জেলার শাল্লা এলাকায় ব্র্যাক প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের পর ভারত থেকে প্রত্যাগত উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনে সহায়তামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এর সূচনা হয়। পরবর্তী সময়ে ব্র্যাক বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং দরিদ্র জনগণের ক্ষমতায়নের মতো দীর্ঘমেয়াদি বিষয়ে মনোনিবেশ করে। বর্তমানে ব্র্যাক ক্ষুদ্রঋণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, মানবাধিকার, নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের জীবনমান পরিবর্তনের লক্ষ্যে তাদের কর্মসূচি পরিচালনা করছে। বিশ্বের ১৩টি দেশে ব্র্যাকের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বেসরকারি সংস্থা (এন.জি.ও)

গ্রামীণ ব্যাংক

গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্য গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের কাছে জামানতবিহীন ঋণসুবিধা পৌঁছানো, মহাজনের অত্যাচার থেকে দরিদ্র মানুষদের রক্ষা, ভূমিহীন মানুষের মধ্যে সঞ্চয়ের মনোভাব গড়ে তোলা এবং দুঃস্থ ও দরিদ্র পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো। এসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৭৬ সালে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনুস। গ্রামীণ ব্যাংক হচ্ছে পল্লীর ভূমিহীন দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের ঋণদানের জন্য একটি বিশেষ অর্থলগ্নিকারী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।

গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করার পূর্বে ড. মোহাম্মদ ইউনুস সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম জেলায় জোবরা গ্রামের জামানতহীনভাবে কৃষকদের ঋণ প্রদান করেন। ঋণ প্রদান করার প্রায়োগিক প্রকল্পের সফলতাই গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ জোগায়। ১৯৭৬ সালে গ্রামীণ ব্যাংক নির্ধারিত কিছু জেলায় তার কার্যক্রম প্রসারিত করে।

বেসরকারি সংস্থা (এন.জি.ও)

গ্রামীণ ব্যাংকের কতিপয় উদ্দেশ্য রয়েছে সেগুলো হলো:

- ✓ দরিদ্র নারী-পুরুষদের জন্য ব্যাংকিং সুবিধা নিশ্চিত করা;
- ✓ সুদখোর মহাজনদের শোষণ ও বঞ্চনার বিলোপ সাধন;
- ✓ বাংলাদেশের বিশাল সংখ্যক বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ তৈরি করা;
- ✓ অবহেলিত গ্রামীণ দরিদ্র নারীদেরকে এমন এক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় আনা, যা তাদের জন্য বোধগম্য হবে এবং তারা তার ব্যবস্থা করতে পারবে:
- ✓ মজুরভিত্তিক কর্মসংস্থানের সঙ্গে পার্শ্বজীবিকার সুযোগ সৃষ্টি করা;
- ✓ কম আয়, কম সঞ্চয় এবং কম বিনিয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্যের যে অতিপুরাতন দৃষ্টান্ত তৈরি হয়েছে তা ভেঙ্গে ফেলা;
- ✓ উৎপাদনশীল ও সঞ্চয়মূলক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা এবং
- ✓ বিনিয়োগ, সঞ্চয় ও আর্থিক উপার্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্যের দৃষ্টান্ত দূরীভূত করা।

বেসরকারি সংস্থা (এন.জি.ও)

বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি

রেডক্রিসেন্ট হলো আন্তর্জাতিক রেডক্রস অনুমোদিত মুসলিম বিশ্বে ত্রাণ ও মানবিক সাহায্য পরিচালনাকারী একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। বিশ্বমানবতার সেবায় নিয়োজিত রেডক্রসের ইতিহাসের মধ্যে রেডক্রিসেন্টের উৎস নিহিত। সরকারের সহযোগী সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবী মানবিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি দুস্থ, পীড়িত, অসহায় ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মূলত মুসলিম বিশ্বে ত্রাণ পুনর্বাসন ও মানবিক সাহায্য পরিচালনায় নিয়োজিত রেড ক্রিসেন্ট আন্তর্জাতিক রেডক্রসের ইতিহাসের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির লক্ষ্য ও উদ্দেশগুলো নিম্নরূপ:

- ✓ মূলনীতিমালা অনুযায়ী মানবতার শক্তিতে যে কোনো অসুস্থতা বা দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের দুঃসময়ে পাশে থাকা এবং তাদের উন্নয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান করা;
- ✓ মূলনীতিমালার আলোকে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটিকে একটি শক্তিশালী ও কর্মদক্ষ জাতীয় প্রকল্পে উন্নীত করা;
- ✓ সকল জাতির মধ্যে শান্তি স্থাপন ও তা বজায় রাখা; এবং
- ✓ দুঃস্থ মানুষের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

বেসরকারি সংস্থা (এন.জি.ও)

ইউনিসেফ বাংলাদেশ

আজকের শিশুরাই আগামী দিনের বিশ্ব কর্ণধার। এই শিশুদের উপযোগী করে বিশ্বকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকার, গোষ্ঠি ও পরিবারকে সাহায্যে করার লক্ষ্যেই ১৯৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের যে সব বিশেষায়িত সংস্থা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শিশুকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, সেসব সংস্থার মধ্যে জাতিসংঘ শিশু তহবিল অন্যতম। কার্যত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ইউরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন যুদ্ধাক্রান্ত দেশের শিশুদের জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য, বস্ত্র এবং ঔষধ সরবরাহের জন্য UNICEF প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৫২ সালের দিকে বিশ্বের অনুন্নত, স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টিসহ সার্বিক কল্যাণে দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা দানের লক্ষ্যে emergency কথাটি বাদ দিয়ে UN Children's Fund (জাতিসংঘ শিশু তহবিল) রাখা হয়। মূল নামে পরিবর্তন আনা হলেও সংক্ষিপ্ত নামটি অপরিবর্তিত থাকে। বর্তমানে ১৯০টিরও বেশি দেশে ইউনিসেফ কাজ করছে। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে শিশুদেরকে জরুরি সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত হলেও এর কার্যক্রম অনেক বিস্তৃতি লাভ করেছে। ফলে পরবর্তীতে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যেও কিছু পরিবর্তন এসেছে।

বেসরকারি সংস্থা (এন.জি.ও)

ইউনিসেফের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

- ✓ ইউনিসেফের অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য হলো শিশু অধিকার রক্ষা, এ্যাডভোকেসি করা, শিশুদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণে সাহায্য করা এবং শিশুরা যাতে তাদের সক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ করতে পারে সেজন্য সুযোগ নিশ্চিত করা;
- ✓ শিশু অধিকার কনভেনশন দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে শিশু অধিকার রক্ষায় শিশুদের প্রতি আচরণের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড তৈরি করা;
- ✓ ইউনিসেফ জোর দিয়ে বিশ্বাস করে যে, শিশুদের সুরক্ষা ও উন্নয়নই মানুষের উন্নতির সর্বজনীন অবিচ্ছেদ্য ব্যবস্থা;
- ✓ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিশুদের জন্য প্রথম অগ্রাধিকার নিশ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক এবং বস্তুগত সম্পদ তৈরি করা এবং শিশু ও তার পরিবারকে যথাযথ সেবা দেওয়ার জন্য সক্ষমতা তৈরি ও উন্নয়নে সাহায্য করা;
- ✓ সকল যুদ্ধ, দুর্যোগ, চরম দারিদ্র্যের শিকার, সহিংসতা ও শোষণের শিকার এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- ✓ শিশু ও নারীদের তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা;
- ✓ শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।
- ✓ সকল প্রকার বৈষম্য যা শিশুর উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তা দূরীভূত করা।

বেসরকারি সংস্থা (এন.জি.ও)

ইউএনডিপি বাংলাদেশ

বিশ্বব্যাপী জনগণের দারিদ্র্য বিমোচন করে মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউএনডিপি বিভিন্ন দেশে-নীতির উন্নয়ন, নেতৃত্বের দক্ষতা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা রিজিলেন্স তৈরি করতে কাজ করছে। বিশ্বের ১৭০ টি দেশে ইউএনডিপি তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিভিন্ন দেশকে সহযোগিতা করছে ইউএনডিপি। টেকসই উন্নয়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি দেশের সামর্থ্য গড়ে তোলাই ইউএনডিপি'র মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও ইউএনডিপি উন্নয়নশীল দেশের কার্যকর উপদেশ, নির্দেশনা প্রদান, প্রশিক্ষণ এবং অনুদান সহায়তা দিয়ে থাকে। ইউএনডিপি'র উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

- ✓ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করা;
- ✓ অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা, অর্থনৈতিক সুযোগে সহায়তা করা বিশেষত নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান;
- ✓ কাঠামোগত অসামাঞ্জস্য দূর করে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক নীতি ও কর্মসূচির উন্নয়নে সহায়তা প্রদান;
- ✓ স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন এবং পরিবেশ উন্নয়নে সহায়তা করা; এবং
- ✓ মানবাধিকার সংরক্ষণ করা এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

গণমাধ্যম

আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে গণমাধ্যমের ভূমিকা

বাংলাদেশের সংবাদ পত্রের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। স্বাধীনতা পূর্ব, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এবং বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের প্রতিফলন ঘটেছে সংবাদপত্রে। কখনো কখনো রাজনৈতিক আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে অনেক রাজনৈতিক আন্দোলনের চূড়ান্ত সাফল্যের পেছনেও ছিল সংবাদপত্র। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিতর্কের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। সংবাদপত্রগুলো বাংলার পক্ষে-বিপক্ষে নানা প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও সংবাদ প্রকাশ করে ভাষার ইস্যুটিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে।

কলকাতা থেকে মুসলিম লীগের সমর্থক পত্রিকাগুলোতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণ প্রসঙ্গে বেশ কিছু প্রবন্ধ ছাপা হতো । দৈনিক ইত্তেহাদ বাংলা ভাষার পক্ষে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছিল। দৈনিক আজাদ, ইত্তেহাদ পত্রিকাগুলোর বাংলা ভাষার পক্ষে জোরালো সমর্থন নির্দেশ করে। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির সঙ্গে বাংলাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহার করার দাবি তোলেন। ১৯৪৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি আনন্দবাজার পত্রিকা এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি অমৃত বাজার পত্রিকা এই খবর প্রকাশ করে। ১৯৪৮ সালে ঢাকায় ভাষা আন্দোলনের শুরুতেই দৈনিক ইত্তেহাদ এই আন্দোলনে জোরালো সমর্থন দেয়। কিছু পত্রিকা বাংলা ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে গঠিত সংগ্রাম পরিষদে 'ইনসাফ, 'জিন্দেগী' ও 'দেশের দাবী' পত্রিকা থেকে তিনজন করে প্রতিনিধি নেওয়া হয়।

গণমাধ্যম

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় গুলিবর্ষণের ঘটনার পর ভাষার প্রশ্নে নিজেদের অবস্থান প্রকাশ করে দৈনিক আজাদ। সেদিন সন্ধ্যায় বিশেষ টেলিগ্রাম প্রকাশ করে দৈনিক আজাদ । 'ছাত্রদের তাজা খুনে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত' ব্যানার শিরোনাম করা হয়। পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রাদেশিক পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। ঘটনার প্রতিক্রিয়া নিয়ে পরবর্তী কয়েক দিন দৈনিক আজাদ প্রচুর সংবাদ ছাপে। দৈনিক আজাদ ভাষা আন্দোলনের পক্ষে সোচ্চার ভূমিকা নেয়। ১৯৬২ সালের শরিফ শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন খর্ব করাসহ কতিপয় নিয়মকানুন সংযোজিত হয়। ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে একে প্রতিহত করে। যা জাতীয়তাবাদী চেতনা দৃঢ় করে। ৬২ সালের এই শিক্ষা আন্দোলনেও গণমাধ্যমের ব্যাপক ভূমিকা ছিল।

স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ১৯৬৬ সালে বাঙ্গালির জননেতা শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা কর্মসূচির ঘোষণা করেন। সারা বাংলায় ব্যাপক গণসংযোগের মাধ্যমে তিনি বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ করতে শুরু করেন। ছয়দফা আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য চক্রান্তের আশ্রয় গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন হাইকোর্টের বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত কুর্মিটোলা সেনানিবাসে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে এ মামলার বিচার শুরু হয়। প্রতিদিনের বিচারের কার্যবিবরণী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং অন্যান্য গণমাধ্যমে জানতে পেরে বাঙালি নিশ্চিত হয় যে, এ মামলাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, সাজানো। এ প্রহসনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণ জাতীয়তাবাদী চেতনায় প্রচণ্ড আক্রোশে ফেটে পড়ে। অবশেষে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের প্রবল চাপের মুখে আইয়ুব খান উক্ত মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন।

গণমাধ্যম

আমাদের মুক্তিযুদ্ধেও গণমাধ্যমে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সংবাদপত্র ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ২৬ শে মার্চ চট্টগ্রাম বেতারের শিল্পী ও সংস্কৃতি কর্মীরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করেন। পরে এটি মুজিবনগর সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সংবাদ, দেশাত্মবোধক গান, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা, রণাঙ্গনের নানা ঘটনা দেশ ও জাতির সামনে তুলে ধরে সাধারণ মানুষকে যুদ্ধের প্রতি অনুপ্রাণিত করে। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস জুগিয়ে বিজয়ের পথ সুগম করে। এছাড়া, মুজিবনগর সরকারের প্রচার সেলের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত 'জয়বাংলা' পত্রিকা মুক্তিযুদ্ধে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে।

৭ মার্চে দেওয়া বঙ্গবন্ধুর বিখ্যাত ভাষণ ঢাকা বেতার থেকে সম্প্রচার করা হয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যখন গণহত্যা শুরু করে তখন ধানমণ্ডির ৩২ নং বাড়িতে শেখ মুজিবুর রহমান ২৫ মার্চ রাত ১২টা ২০ মিনিটে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এ ঘোষণা গণমাধ্যমের মাধ্যমে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক বেশ কিছু গণমাধ্যম তৎকালীন পাকিস্তানের বর্বর ও নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে এক সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছিল, দুই ব্রিটিশ সাংবাদিক সাইমন ড্রিং ও ফটোসাংবাদিক মাইকেল লরেন্ট লন্ডনের 'ডেইলি টেলিগ্রাফে' একটি প্রতিবেদন পাঠান; যার শিরোনাম ছিল 'ট্যাঙ্কস ক্রাশ রিভোল্ট ইন পাকিস্তান'। অ্যান্থনি মাসকারেনহাস পাকিস্তানের নির্মমতা দেখে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। অ্যান্থনি লন্ডনের সানডে টাইমস পত্রিকায় পাকবাহিনীর গণহত্যা নিয়ে তার লেখা একটি প্রতিবেদন প্রচার করেন যা বিশ্বে ব্যপকভাবে সাড়া ফেলে।

গণমাধ্যম আজ সর্বত্র সর্বব্যাপী। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মিডিয়া প্রবল প্রতাপে বিবর্তমান আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক চর্চাগুলোর ভিতর মধ্যস্ততায় লিপ্ত আছে, ব্যক্তিক ও সামষ্টিক পরিচয় নির্মার্ণ করছে, আমাদের জীবনযাত্রার নকশা নির্ধারণ করে দিচ্ছে। গণমাধ্যম বা মিডিয়ার ক্ষমতা অনেক। গণমাধ্যমের ক্ষমতা সম্পর্কে অমর্ত্য সেন বলেছেন, 'কোনো রাষ্ট্রে গণমাধ্যম স্বাধীন হলে দুর্ভিক্ষও ঠেকিয়ে দেওয়া যায়'। অজ্ঞতা ও ভুল তথ্যের ওপর ভিত্তি না করে জনগণ রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞাত হয়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে পারে, সচেতন ভোটাররা তখন খারাপ শাসককে ক্ষমতা থেকে ফেলে দিতে পারে। আবার গণমাধ্যমের সঠিক চর্চা রাষ্ট্র ও জনসাধারণের মাঝে সেতু তৈরি করে।

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- সুশীল সমাজ বলতে কী বোঝেন? [৪১তম বিসিএস]
- এনজিও এবং সুশীল সমাজের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করুন। [৪১তম বিসিএস]
- ইপিজেড (EPZ) কীভাবে বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়নে ভূমিকা রাখছে? [৪০তম বিসিএস]
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (BEZA) ও বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের (BEPZ) মধ্যে পার্থক্য কী? [৪০তম বিসিএস]
- বাংলাদেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে পাঁচটি প্রতিবন্ধকতা তুলে ধরুন। [৩৫তম, ২২তম, ১১তম বিসিএস]
- ই.পি জেড কি? ই.পি জেড কিভাবে শিল্প উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে? [৩২তম বিসিএস]
- বাংলাদেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অন্তরায়সমূহ কী কী? কীভাবে তা হতে উত্তরণ সম্ভব? [২৩তম, ২১তম, বিসিএস]
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সেক্টরে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে কী কী পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে? [২৩তম বিসিএস]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

❑ **টীকা:**

➢ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা [২৯তম বিসিএস]

➢ এক্সপোর্ট প্রমোশন জোন [১১তম বিসিএস]

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/Uttoron

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি (https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

09666775566
www.uttoron.academy